
অনেক রাতের কাব্য
যযাতি

অনেক রাতের কাব্য

যযাতি

বিংশ শতাব্দী প্রকাশনী

* প্রকাশক
শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বিংশ শতাব্দী প্রকাশনী
২০, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫

* মুদ্রক
শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
লিওনার্ড কার্ডবোর্ড বক্স ফ্যাক্টরী প্রাইভেট লিমিটেড
১।১ গ্যালিফ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৩

* প্রচ্ছদ
শচীন্দ্র বিশ্বাস

আড়াই টাকা

উৎসর্গ

শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে

খুট্ করে একটা শব্দ হলো। পরিচিত শব্দ। জানলার সার্সি খোলার শব্দ। চোখ না খুলেই বুঝ্তে পার্লো সুদেষ্ণা। বুঝ্তে পার্লো সকাল হয়েছে। এই শব্দটার সঙ্গে সঙ্গে সে পাশ ফিরে শোবে আর লেপটাকে আর একটু টেনে গায়ের সঙ্গে আর একটু জড়িয়ে নিয়ে নরম বালিশের মধ্যে মুখটা আর একটু বেশি গুঁজে আরও কিছুক্ষণের জন্য শোবে। সুদেষ্ণা আরও জানে, ঝি দুলালের মা সার্সিটা খুলে দিয়ে গিয়ে আবার আস্‌বে চা নিয়ে, একবার—মাত্র একবারই ডাক্‌বে। একবারের বেশি ডাক্‌তে হবে না, সুদেষ্ণা নিজের তাগিদেই উঠে পড়্বে, ঠাণ্ডা চা খেতে ওর ঠিক সেই রকম খারাপ লাগে যেমন খারাপ লাগে ট্রামে-বাসে বাপের বয়সী লোকগুলো ওর দিকে লাল-পড়া চোখে তাকিয়ে থাক্‌লে। তাই দুলালের মা একবারের বেশি ডাক্‌বে না, এবং ও-ও তাড়াহুড়ো না করে আস্তে আস্তে বিছানায় উঠে বস্‌বে, বডিস্-ব্লাউজটা ঠিক করে নেবে, ছড়ানো চুলগুলোকে টেনে-টেনে বাঁধ্বে, তারপরে আল্‌তো হাতে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেবে। তারপরে যাবে বাথ্-রুমে। এই হোল রোজকার নিয়ম।

খুট্ করে সেই পরিচিত শব্দ হলো আজও জানলার সার্সি খোলার। সকালের নরম রোদ এক ঝলক ঢুক্‌লো ঘরে—পশ্চিমের দেয়ালে গিয়ে পড়্লো যেখানে কোন একটা আর্টের বই থেকে কেটে নেওয়া ম্যাডোনার বাঁধানো ছবিটা টাঙানো রয়েছে। সুদেষ্ণা অন্যদিনের আওয়াজের সঙ্গে আজকের আওয়াজে যেন একটু তফাৎ খুঁজে পেলো। লেপটাকে টান্‌তে গিয়ে ওর চোখ দুটো গিয়ে পড়্লো ম্যাডোনার ছবিটার দিকে। মাথার দিকে না তাকিয়েও ও বুঝতে পার্লো দুলালের মা জান্‌লা থেকে সরে যায় নি।

এক সেকেণ্ড—পাঁচ সেকেণ্ড—বিশ সেকেণ্ড। ম্যাডোনার ছবিটা

ঝাপ্‌সা হয়ে এলো ওর চোখের সাম্‌নে। ঘুমের আবেশ ওর চোখ ছেড়ে যায় নি। লেপটা টান্‌তে ভুলে গিয়েই ও চোখ ‧দুটো বন্ধ কর্‌লো। পরক্ষণেই আবার অন্যদিনের মতো আরও বেশি করে আঁকড়ে ধর্‌লো লেপটাকে, নরম বালিশের মধ্যে মুখটাকে গুঁজে দিলো। কী ভালো লাগ্‌ছে আজকের সকালটাকে—এমন রোদের সঙ্গে যেন ওর পরিচয় এই প্রথম। কেমন মিষ্টি-মিষ্টি। যেন শেখরের চোখের চাউনির মত। এই সকালটাকে যদি ও বাঁধিয়ে রাখতে পারতো তাহলে হয় ত শেখরকে দেখিয়ে বল্‌তে পার্‌তো—চিন্‌তে পারেন? শেখর নিশ্চয়ই চিন্‌তে পার্‌তো না, বুঝ্‌তে পার্‌তো না, অসহায়ের মতো তাকিয়ে থাক্‌তো বোকা-বোকা চোখে। সুদেষ্ণা হাস্‌তে হাস্‌তে তখন বল্‌তো—আপনি ঠিক এই রকম করে চেয়ে থাকেন আমার দিকে।

কিন্তু ম্যাডোনোর ছবিটা ঝাপ্‌সা লাগে তবু। একটা ছায়া যেন পড়ছে ছবিটার ওপর। সুদেষ্ণা মুখ তুলে তাকায় জানলার দিকে। বাবা—বাবা দাঁড়িয়ে জানলার সাম্‌নে এই সাত-সকালে! ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে সুদেষ্ণা—বাবা, তুমি!

জীবনবাবু হাসলেন। সুদেষ্ণার মাথার দিক থেকে সরে এসে বস্‌লেন খাটের পাশের চেয়ারটায়। সুদেষ্ণা জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। বাবা তাকে ডেকে না পাঠিয়ে নিজেই কেন এলেন এটা সে ভেবে পেলো না। মুখ দেখেও তো মনে হয় না কোন বিরক্তির কারণ ঘটেছে তাঁর, বরং অবসরপ্রাপ্ত অসুস্থ এই মানুষটার মনেও যেন আজকের সকালের প্রশান্তির ছোঁয়া লেগেছে। রোগ-যন্ত্রণার পরিচিত ছাপ যেন তাঁর মুখে নেই। আজকের সকালটা কী ভালো, কী সুন্দর। ছোটোবেলার সেই বকুল ফুল কুড়োনোর সকালগুলোর কথা যেন মনে পড়ে।—চা খেয়ে আমার ঘরে এসো, কথা আছে। জীবনবাবু উঠ্‌লেন।

সুদেষ্ণার মনে হলো সকালের রোদ যেন খানিকটে স্তিমিত হয়ে এসেছে। বাবা নিজে এসেছেন তার ‧ঘরে। কী এমন জরুরী কথা আছে তাঁর যার জন্যে এই সুন্দর সকালটাকে সুদেষ্ণার তিনি ভারী করে দিয়ে গেলেন। সুদেষ্ণার কপালে চিন্তার পাহাড় আঁকা হয়ে যায়। জান্‌লার বাইরে তাকিয়ে থাকে সে।

—দিদিমণি, চা। —দুলালের মা হাসি-হাসি মুখে চায়ের পেয়ালা

ত্রিপদীর ওপর রাখে। দেরী হওয়ার জন্যে লজ্জা-ভয়ের বদলে তার অসুন্দর মুখটাও সপ্রতিভ লাগে। সুদেষ্ণা বিরক্তি প্রকাশ করে না বরং বিস্মিত হয়।

দুলালের মা ভালো করে জানলা-দরজাগুলো খুলে দেয়—হুড়মুড় করে আরো অনেক ঝলক স্নিগ্ধ রোদ ঘরে এসে ঢোকে—রোদের স্মিত চাউনিতে সুদেষ্ণার ফোলা-ফোলা চোখ-মুখ আরও সুন্দর হয়ে ওঠে। কপালের ওপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে বাঁ হাতে, ডান হাত দিয়ে গালের ওপরটা বুলিয়ে নেয়—নিজের সৌন্দর্যকে আঙুল দিয়ে যেন পরখ করে। আর বাইরের দিকে তাকিয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে কেমন একটা ভালোলাগার শিরশিরানি তার সমস্ত মনটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে কেমন নিস্তব্ধ রাতের বুকে বাতাসের নীরব চলাফেরার আওয়াজ হয়। হাজারো বলিষ্ণু ইচ্ছার পদধ্বনি যেন তার বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে।

সুদেষ্ণার মনে হয় কোন-কোন মেয়ে যেমন রান্নাঘরে হাঁড়ি ঠেল্‌তে জন্মায়, সুদেষ্ণাও তেমনি যেন কাউকে-না-কাউকে ভালোভাসার জন্যে জন্মেছে। এই কথাটাই যেন সে আজকের সকালে আবিষ্কার কর্‌লো। কোন বড় সংগীতকারের বাড়ীর মেয়ে কিংবা কোন বড় চিত্রশিল্পীর বাড়ীর যে কোন সাধারণ ছেলে যেমন আজ সহজে সংগীত বা চিত্রশিল্প সম্বন্ধে মাতব্বরি চালে কথা বল্‌তে পারে, তেমনি অতি সহজে সুদেষ্ণাও ভালোবাসার কথা বল্‌তে পারে। ভালোবাসা আর সুদেষ্ণা যেন সমার্থক। ছোটোবেলা থেকেই, যখন সে ফ্রক ছেড়ে শাড়ী ধরে নি তখন থেকেই তার ধারণা কোন একজনকে সে ভালোবাসে—সেই কোন একজন এলেই সে ভালোবাসার তাকে একেবারে আচ্ছন্ন করে দেবে। তাই মা যেদিন বলেছিল, 'তুমি আর ফ্রক পরে স্কুলে যাবে না, তোমার জন্য শাড়ী আনা হয়েছে, শাড়ী পরে যাবে,' সেদিন থেকে সুদেষ্ণা এক দারুণ উৎকণ্ঠায় দিন কাটিয়েছে, তার ভয়, কখন বুঝি সেই কোন একজন এসে খালি হাতে ফিরে চলে যায়।

কিন্তু তার স্কুলের জীবনে সেই কোন একজন আর আসে নি।

তারপরে একদিন কলেজ থেকে ফিরে দেখে মা একটি ছেলের সঙ্গে কথা বল্‌ছে। একবার একটু তির্যকদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়েছিল সুদেষ্ণা, এবং তাকিয়েই চলে আস্‌ছিল পাশের ঘরে কিন্তু মা ডাকলো—শোন্‌।

ফিরতেই হলো স্থদেষ্ণাকে, অবশ্য মা তাকে না ডাকলে সে মা-র ওপর ভীষণ চটে যেতো, হয়ত সেদিন সে কলেজ-ফেরৎ জলখাবার না খেয়েই গলির ওধারের বাড়ীর স্থনীলার সঙ্গে গল্প করতে চলে যেতো। মা ডাক দেওয়ায় স্থদেষ্ণা এবার আয়তদৃষ্টিতে তাকাবার স্থযোগ পেলো ছেলেটির দিকে। নাঃ, দেখতে ভালোই, বয়সের তুলনায় ঢ্যাঙা হবে একটু, তা বেঢপ নয়।

—শোন্ স্থদেষ্ণা, এ হচ্ছে অশোক, তোমার বড়মাসির ননদের ছেলে। তোমাদেয় কলেজে ভর্তি হয়েছে।

এই হলো অশোকের সঙ্গে পরিচয়ের স্থত্রপাত। অশোকরা অনেকদিন ছিল বর্মায়, তারপরে এখানে এসে উঠেছে। যথারীতি অশোক আর স্থদেষ্ণার খাতির হয়ে গেলো—কলেজে সাধারণ দেখাশুনা ছাড়াও চৌরঙ্গীর অভিজাত রেঁস্তোরায় এবং অনেক সময়ে স্থদেষ্ণাদের বাসায় ছুটিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিয়েছে। আজ আশ্চর্য লাগে স্থদেষ্ণার কলেজ ছাড়িয়ে য়ুনিভার্সিটিতে গিয়েও কিন্তু স্থদেষ্ণা অশোককে ওই চার অক্ষরের শব্দটি শোনাতে পারে নি। অথচ সে জান্‌তো যে ঐ অশোকের জন্যেই যেন সে আনন্দিত উৎকণ্ঠায় দিন কাটিয়েছে। দিদিমা ঠিকই বলেছিলেন, স্থদেষ্ণার এখনও বিয়ের ফুল ফোটে নি। না হলে যখন অশোক এসে বল্‌তো য়ুনিভার্সিটির কোন মেয়েটাকে তার কী জন্যে ভালো লাগে, কাকে তার গভীরভাবে ভালোবাস্‌তে ইচ্ছে হয়, তখন অশোকের মাথাটা কোলের ওপর নিয়ে স্থদেষ্ণা-ই তাকে সান্ত্বনা দিয়ে গেছে, অথচ মুখ ফুটে নিজের কথাটা বল্‌তে পারে নি। তারপরে যেদিন অশোক সত্যি সত্যি এসে আনন্দের সঙ্গে স্থদেষ্ণাকে জানালো গীতা তাকে কথা দিয়েছে, সেদিন স্থদেষ্ণা শুধু এইটুকু বল্‌তে পেরেছিল, শরীরটা আজ আমার ভালো নেই, ভীষণ মাথা ধরেছে। স্থদেষ্ণার মাথা ধরায় অশোক মোটেই চিন্তিত হয় নি, বরং আজ গীতা তাকে কী কী কথা বলেছে এটা শোনাতে না পেরে অশোক যেন একটু মনমরা হয়েই চলে গেল। আর ঐ দিনই সকালে স্থদেষ্ণা মা-কে জানিয়েছিল অশোককে ছাড়া সে কাউকে বিয়ে করবে না। ওর কথায় মা একটু অবাক হয়েছিল—বলিস্ কি রে, তোর দিদির বিয়ের কোন ব্যবস্থা করতে পারলাম না আর তুই নিজে-মুখে বল্‌লি অশোককে ছাড়া বিয়ে করবিনে। শোন কথা।

সুদেষ্ণা তাতে দমে নি, বরং বলেছিল, তোমরা যদি দিদির বিয়ে না দাও ত' আমি অপেক্ষা করবো কেন।

বলেই উঠে এসেছিল সুদেষ্ণা সেখান থেকে। পরে দিদির কাছ থেকেই শুনেছে, কথাটা মা বাবার কানে তুলেছে, এবং বাবা শুনে খুব প্রসন্ন হন নি। আর এদিকে সন্ধ্যেবেলা অশোক গীতার খবর নিয়ে এলো, সুতরাং সুদেষ্ণার মাথা না ধরে উপায় নেই। নিজের ঘরে ঢুকে অঝোরে কেঁদেছিল সেদিন সুদেষ্ণা। অশোকের ওপর তার রাগ হলো না, নিজের পরেও তার কোন ক্ষোভ এলো না, তার ভালোবাসার ওপরেই অভিমান মারাত্মক হয়ে উঠলো।

আজ সকালে সেই কথা তার মনে পড়লো। আর মনে পড়লো সেই সঙ্গে সেদিন ভালোবাসার দেবতা যেমন মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল, সেই সঙ্গে বাসার সঙ্গে ও তার সম্পর্কটা কখনই সহজ হয় নি। মা মারা গেলে ছেলেমেয়ের ওপর পিতার যে স্নেহধারা অত্যধিক উজ্জ্বল হয়ে ওঠা স্বাভাবিক ছিল, সুদেষ্ণার মা মারা যাওয়ার পরে সুদেষ্ণার ক্ষেত্রে তার বাবার তেমনটি হয় নি। বরং তিনি দিদির সঙ্গে যেন বেশি সহজ হয়ে কথা বল্‌তে পারেন। তাছাড়া, দিদি মাষ্টারী নিয়ে বাইরে থাকে—কলকাতা থেকে বেশ খানিকটে দূরে। ছোটোখাটো ছুটিতে বড় একটা আসে না—দুটো বড় বড় ছুটিতেই দিদি আসে। তখনই বাবা যেন একটু সহজ প্রশান্তিতে ঝলমল করে ওঠেন। না হলে বিধবা পিসিমার সঙ্গে তাঁর যতো কথা। সুদেষ্ণা বেশ মনে করতে পারে মা মারা যাওয়ার এই তিন বছরের মধ্যে বাবা তার সঙ্গে ক'টা কথা বলেছেন। যেদিন প্রথম চাকরিটা নেবে বলে ঠিক করে সরকারী অফিসে, সেদিন বলেছিলেন চকিত-হাসিতে দীপ্ত হয়ে—শেষ পর্যন্ত চাকরী করাটাই পছন্দ করলে?

প্রশ্নের কোন উত্তরের অপেক্ষা তিনি করেন নি, সুদেষ্ণাও উত্তর দেওয়ার জন্যে কোন প্রয়োজন বোধ করে নি। তারপরে আজ আবার কী জরুরী কথা বলার জন্যে সাত-সকালে নিজেই অসুস্থ শরীরটাকে টানতে টানতে সুদেষ্ণার ঘরে এসেছেন, সুদেষ্ণা তা ভেবেই পায় না। বাবার জরুরী কথার চেয়ে কিন্তু বড় জিনিস আজ সকালে সে আবিষ্কার করেছে। এই সকাল তাকে উনমনা করেছে। থেকে থেকে শেখরের কথাটা মনের মধ্যে আসছে, নামটাকে বার-বার উচ্চারণ করেছে।

দূরগামী যাত্রী বোম্বাই ট্রেনের কামরায় একভাবে বসে থাকতে থাকতে যেমন ঝিমুনি আসে এবং একভাবে বসে থাকার জন্যে দেহে একটা অসাড়তা এসে সেই ঝিমুনিকে নষ্ট করে দেয় কিন্তু পরক্ষণে অন্যভাবে বসে আবার সেই ঝিমুনি সেই তন্দ্রাটাকে ধরবার চেষ্টা করি, সুদেষ্ণাও তাই করছে। সুন্দর সকালে শেখর তাকে মাতাল করছে, কিন্তু বাবার সম্ভাব্য জরুরী কথাটাও মাঝে মাঝে এসে পড়েছে তার মনে।

খবরের কাগজটা সরিয়ে রেখে অভ্যাসমতো একখানা থিওলজির বই টেনে নিয়েছেন জীবনবাবু। সরকারের উচ্চপদ থেকে তাঁর রিটায়ার করার পরে আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীবিয়োগের ফলে তিনি যেন হঠাৎ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছেন। এবং একেবারেই কিছু করবার না থাকায় যেন অরক্ষিত জীবনবাবুকে ব্যাধি এসে আক্রমণ করেছে। অবসরের জীবনটা যে রসিয়ে রসিয়ে ভোগ করবেন এমন সময় বা সুযোগ তাঁর হলো না। হালভাঙা নৌকার মতো যেন তিনি মাঝদরিয়ায় গিয়ে পড়েছেন। একটা মেয়ে মাষ্টারী নিয়ে বাইরে থাকে, ছেলেটাও দিল্লীতে চাকরী জুটিয়েছে—আর এই ছোট মেয়েটা ত' তাঁকে এড়িয়ে চলে, কখন আসে যায় তিনি টেরই পান না। ছোট মেয়ে সাধারণত বাবার হাতের কাছে থাকবে, তা নয়, তার কেশাগ্রও তিনি দেখতে পান না।

বাবা!

জীবনবাবু বই থেকে মুখ তুললেন, ইজিচেয়ারের হাতলের ওপর দুটো কনুইয়ের ভর দিয়ে বসলেন। এবং আতস্মিত হাসিতে মেয়েকে বলতে ইঙ্গিত করলেন। এতোক্ষণের বিরক্তি মন থেকে যেন ঝেড়ে ফেলতে পেরেছেন।

সুদেষ্ণা বসলো না—চেয়ারটা ধরে দাঁড়িয়ে রইল।

—বসো,—জীবনবাবু এবারে অনুচ্চকণ্ঠে বসতে বললেন, সুদেষ্ণাকে পরক্ষণেই দেয়াল ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বললেন, ওঃ, তোমার তো আবার অফিসের বেলা হচ্ছে। স্নান সেরে একেবারে তৈরী হয়ে এসেছো দেখছি।

সুদেষ্ণা একটু চুপ করে থেকে বললো, তোমার কী যে কথা বলার ছিল বললে তখন, তা সে কি অল্প সময়ে হবে না?

সুদেষ্ণার কথায় জীবনবাবু একটু চমকে গেলেন। এমন মেপে মেপে কথা বলে সুদেষ্ণা, এমন রসহীন! মেয়েকে তিনি চেনেন না বলে মনে হলো। ভ্রূ কুঁচ্‌কে গেল তাঁর ক্ষণিকের জন্যে; আবার সহজ হয়ে বল্‌লেন, না, বেশি সময়ের ব্যাপার নয়, তবে কথাটা খুব তাড়াতাড়ির নয়, তাই ভাবছিলাম অফিসের সময়ে না বলাই ভালো।

—না, না, তুমি বল্‌তে পারো, আমার অফিসের এখনও যথেষ্ট দেরি আছে।

সুদেষ্ণার স্বরে তিনি যেন আন্ধার খুঁজে পান্। কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে বিশেষ এই ছোট মেয়েটার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ এতো কম যে অন্যান্য কথাও তিনি বল্‌তে পারেন না ত' আজকের তাঁর জরুরী কথা! তিনি আম্‌তা আম্‌তা করেই বল্‌লেন, তা কথা আর কি। এই তোমরা সব কে কোথায় আছো থাকো, আমি সব ঠিক পাইনে।

—কেন, তুমি পরশু যে দাদা আর দিদির চিঠি পেয়েছো, পিসিমা বল্‌লে,—সুদেষ্ণা দ্রুত বলে গেল।

—তা অবিশ্যি পাই নি যে তা নয়; তবে তোমার খবর তো পাইনে এক বাড়ীতে থেকেও, তাইতে তো ডাকলাম।

সুদেষ্ণা বুঝ্‌লো এটাও বাবা তাকে ঠিক বল্‌ছেন না। একটু রাত করেই সে ফেরে বটে, কিন্তু খবর ত' পিসিমার মারফৎ বাবা ঠিকই পান্। তবু চুপ্ করে থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ ভেবে কোন কথা না বলে মাটির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তাছাড়া বাবার গলায় কোন উত্তাপ নেই।

—বল্‌ছিলাম কি,—জীবনবাবু থাম্‌লেন, সুদেষ্ণাও মুখ তুলে চাইলো।

—বল্‌ছিলাম,—আর একবার থাম্‌লেন জীবনবাবু। সেই অবসরে এতোক্ষণে সুদেষ্ণা চেয়ার টেনে নিয়ে বাবার ইজি-চেয়ারের ডানদিকের হাতার কাছে বসে পড়লো।

—তোমার মা বেঁচে থাক্‌লে কথাগুলো তিনিই তোমাদের বল্‌তেন। তোমার পিসিমা অবিশ্যি এখন বল্‌তে পারেন, কিন্তু তোমার পিসিমা বলেন তাঁর কথা তোমরা কেউ আমল দাও না, হেসে উড়িয়ে দাও। তাই আমাকে বল্‌তে হচ্ছে।—কোনদিন যিনি মেয়ের সঙ্গে একটা-দুটোর বেশি কথা বলেন না, তিনিই এক সঙ্গে এতোগুলো কথা বলে যেন হাঁপিয়ে উঠ্‌লেন। থাম্‌লেন। একটু। সুদেষ্ণাও আন্দাজ কর্‌তে না পেরে বাবার

বক্তব্যের লক্ষ্য উপলক্ষ্য কী ভেতরে ভেতরে যেন একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। সামান্য মুহূর্তগুলো যেন বিলম্বিত হতে লাগলো।

—বলছিলাম, শঙ্কু বাইরে থাকে, খুব অসুবিধে হচ্ছে, ওর বিয়েটা না দিলে চলে না আর।—এই কথায় এতোক্ষণে সুদেষ্ণা একটু আলো দেখতে পায়। মনে মনে হাসি পায়, দাদার অসুবিধে হচ্ছে তাই বিয়েটা না দিলে চলে না। আর দিদির? সুদেষ্ণার? প্রশ্নগুলো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। অসুবিধে হচ্ছে শুধু, না, বয়েস বাড়ছে? দাদা তার থেকে ক' বছর বড়?

মনে মনে রোমন্থনার দীর্ঘ সময় না দিয়ে জীবনবাবু বললেন—শোভনা তোমার পিসিমাকে জানিয়ে দিয়েছে সে বিয়ে-টিয়ে করবে না। ওই মাষ্টারী নিয়েই থাকবে। তারপর রইলে তুমি। তোমার বয়স হয়েছে, চাকরী-বাকরী করছো, তোমার মতামতেরও প্রশ্ন আছে।—আবার থামলেন জীবনবাবু। গলাটাকে একটু পরিষ্কার করে নিলেন! সুদেষ্ণার বুকের মধ্যে তোলপাড় সুরু হয়ে গেছে। তার মতামতের প্রশ্ন আছে—এ কি সেই অশোক-ঘটিত ব্যাপারের প্রতি বাবার একটা নির্মম খোঁচা। ও বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কোন আঘাতের আশঙ্কা সে মুখ দেখে করা চলে না। কেমন একটা মায়া হয় বাবাকে দেখে। এতোদিন কী আশ্চর্য অনুদার উপেক্ষায় সে বাবাকে এড়িয়ে চলেছে। নিজের কাছে সে ছোট হয়ে যায়। মা মারা যাওয়ার পরে কোনদিনই সে বাবার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে নি। তাঁর অভাব-অসুবিধের কোন খবর নেওয়াও প্রয়োজন বোধ করে নি। অথচ আজ সেই বাবা তার বিয়ের জন্যে চেষ্টা করছেন। বললেন কিনা মতামতেরও প্রশ্ন আছে। সুদেষ্ণার চীৎকার করে বলে উঠতে ইচ্ছে হলো, না, কোনও মতামত নেই। তুমি যা বলবে তাই হবে। হাতে ধরে যার কাছে সঁপে দেবে তাকেই সুদেষ্ণা জীবন-সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করবে, কোন বাধো-বাধো ঠেকবে না তার। তার শিক্ষা-দীক্ষা রুচি-অভিজাত সংস্কারের কোন কিছুই তাতে অন্তরায় হবে না। সে চায় একটা পরিপূর্ণ হৃদয়—একটা মানুষ।

—বাবা।—সুদেষ্ণা গাঢ়কণ্ঠে ডাকলো। জীবনবাবু চাইলেন ওর দিকে।

—কিছু বলবে?

—আমার অফিসের সময় হয়ে গেছে। বিকেলে ফিরে তখন কথা হবে।

জীবনবাবু ভাব্‌লেন বিয়ে-টিয়ের কথায় স্থদেষ্ণা একটু অস্বস্তি বোধ করছে, তাই ছুতো করে চলে যেতে চায়। মনে মনে হাস্‌লেন তিনি। বয়েস হয়েছে তাঁর মেয়ের তবু বিয়ের কথায় লজ্জা পাচ্ছে, বয়েস হলেও বিয়ে না হলে মেয়েরা চিরকাল মেয়েই থাকে—সঙ্কোচে লজ্জায় আরক্তিম হয়ে উঠ্‌তে সামান্য কারণই যথেষ্ট তাদের। পুরুষের সঙ্গে এক অফিসে চাকরী-করা মেয়ের যা অবস্থা এই ব্যাপারে, ছঁদে স্কুল-মাষ্টারণীরও তা। স্থতরাং হেসে বল্‌লেন, এসো।

জীবনবাবুর ধারণা হলো মেয়ের সম্বন্ধে তাঁর এতোদিনের ধারণাটা ভুল হয়ে গেছে। শুধু ছোট মেয়ে সম্বন্ধেই নয়, শোভনা সম্বন্ধেও তাঁর ধারণাটাও যথোচিত হয় নি। কোথাও কর্তব্যে তাঁর অবহেলা ঘটেছে। সারা জীবন চাকরী করেছেন, উচ্চপদের মোহ তাঁকে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে গেছে জীবনের পথে—ঘরের দিকে ফিরে তাকাবার অবসর পান নি। স্ত্রীর ওপর তাঁর এতোদিন পরে রাগ হলো—এই সব দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করাও হয় নি সময় মতো। তাহলে হয়ত মাষ্টারী নিয়ে শোভনা বাইরে গিয়ে থাক্‌তো না, স্থদেষ্ণাও এমন করে বে-পরোয়া হয়ে উঠ্‌তো না। গাফিলতি আজ তাঁকে মেয়েদের কাছে করুণার পাত্র করে তুলেছে। এখন যে সেই আগেকার ভুল সংশোধন করে নেবেন তার উপায়ও নেই—আজ তিনি চলচ্ছক্তিরহিত অথর্ব বৃদ্ধ। তবু তার মনে হলো বোধ হয় এখনও খুব দেরি হয়ে যায় নি—এখনও সময় আছে কিছুটা। চঞ্চল হয়ে উঠলেন বৃদ্ধ। স্থদেষ্ণাকে তাঁর অতিরিক্ত ভালো লেগে গেলো।

একবার ভাবলেন অশোকের কথা। তাঁর বড় শালীর ননদের ছেলে। স্থদেষ্ণার তাকে খুব পছন্দ হয়েছিল; মুখ ফুটে বলেও ছিল সে—সে-কথা। কিন্তু তারপরে কী যে হলো বোঝা গেল না। আর আস্‌তে দেখেন নি ছেলেটাকে। তারপরে একদিন তার বিয়েও হয়ে গেল। আজকালকার ছেলে-মেয়েদের ধরণ-ধারণ বোঝেন না জীবনবাবু। বোঝেন না বলেই নিজেকে অসহায় বোধ করেন। অতিরিক্ত অসহায় বোধ করেন।

অফিসের পোষাকে তৈরী হয়ে নিল স্থদেষ্ণা। অফিসের পোষাক, না বিয়ের সাজ? —হাসি পায় স্থদেষ্ণার যদিও কথাটা ওর নয়—ওর এক সহকর্মীর রেণুকার। ক'দিন আগে রেণুকা ওর দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেছিল

—তোর হলো কি, সুদেষ্ণা? দিন-কে-দিন রঙবাহার হয়ে উঠছিস্ যে। একেবারে বিয়ের সাজ সেজেছিস! এটা কি বয়েসের দোষ?

সুদেষ্ণা হেসে উঠেছিল, বলেছিল, না, বয়েস ঢাকবার দোষ।

তারপরেই সামনে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল সান্ত্বনাকে। সকলে মুচকি হাসিতে ভরে উঠলো সামনের টেবিলের সান্ত্বনার দিকে তাকিয়ে। নানারঙের হৈ-চৈ শাড়ীতে ঐ কালো কৃশকায় মেয়েটাকে এতো অসুন্দর লাগে যে মেয়ে হয়েও সুদেষ্ণা ওর দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাক্‌তে পারে না, ওর সঙ্গে বসে বসে কথা বলা তো দূরের কথা।

কেন্দ্রীয় সরকারের এই অফিসটাতে যখন প্রথম মেয়েদের কেরাণীগিরি করার সুযোগ দেওয়া হয়, তখনই সান্ত্বনা এখানে ঢুকতে পায়। কেরাণীর সংখ্যা তখন অনেক কম, এখন ত' স্বাধীনতা লাভের পরে দেড় হাজার কেরাণীর মধ্যে শ'খানেক মেয়ে। তখন সান্ত্বনা ছিল একা—এক অফিস পুরুষ কেরাণীর মধ্যে পুরুষ কেরাণীরা অফিসের বড়কর্তাদের রুচির প্রশংসা কর্‌তে পারে নি এ কথা শুনেছে সে অফিসের অনেক পুরুষ কেরাণীর কাছে—তারা রেখে ঢেকে মন্তব্য করে নি, বিশেষত অভয়বাবু। অভয়বাবুর রিটায়ার করার বয়েস হয়ে গেলেও আর সাত-সাতটি ছেলেমেয়ের বাবা হয়েও রসিকতায় ওস্তাদ। সুদেষ্ণার প্রথম প্রথম ওঁকে খানিকটে 'ভালগার' মনে হলেও এখন অভয়বাবুর রসিকতায় প্রাণ খুলেই যোগ দেয়। সেদিন অভয়বাবু একটা মজার রসিকতার গল্প বললেন। তখন সবে বিয়ে করেছেন অভয়বাবু কিন্তু অফিসার সে কথা মানবেন না, হুকুম দিলেন শনিবার পাঁচটা পর্যন্ত থেকে অফিসের কাজটা তুলে দিয়ে তবে যেন অভয়বাবু বাড়ী যান। অভয়বাবু একটু মুসকিলে পড়্‌লেন, তাড়াতাড়ি বাড়ী না ফিরলে নয়। অফিসারের ঘরে গিয়ে বল্‌লেন, স্যর, আজ আর কাজ হবে না।

—কেন?

—শনিবারের বাজার, যে ফাইলটা ধরবো সেটা তো খোঁপা বলে মনে হবে।

—খোঁপা! কী বলছেন যা-তা!

—হাঁ স্যর, নতুন বিয়ে করেছি কি না।—অভয়বাবু অকুতোভয়ে বলে যান। শুনে অফিসার একটু হাসলেন, কিন্তু অভয়বাবুর ছুটি মঞ্জুর হয়ে গেল। কারণ অফিসারও যে তখন সদ্য বিয়ে করে এসেছে। এই খবরটা

অভয়বাবু জানতেন। অভয়বাবু বলেন, অফিসারদের সে-মেজাজ আর নেই, কেমন যেন হয়েছে আজকাল।

সেই অভয়বাবুর কাছ থেকে সান্ত্বনা-সম্পর্কিত গল্পটা শুনেছে স্বদেষ্ণা। খুব রসিয়ে বলেছিলেন অভয়বাবু, হয়ত কিছু খাদ মিশানো ছিল সেই গল্পে, হয়ত কিছু কেরাণাসুলভ অতিরঞ্জনের রঙ। কিন্তু সান্ত্বনার দিকে তাকালে স্বদেষ্ণার মনে হয় হয়ত-বা অভয়বাবু কিছু কম করেই বলেছেন, হয়ত-বা অনির্দেশ্য সহানুভূতির জারকরসে কিছু-কিঞ্চিৎ বাদ দিয়ে বলেছেন। কারণ, গল্পটা শেষ করে অভয়বাবু বলেছিলেন, আহাঃ, বেচারা যায় কোথায়! বাবা নেই মা নেই, ভাইয়ের সংসারে দাঁড়াবার জায়গা চাইলে হবে অনধিকার প্রবেশ।

অফিসের চাকরী করতে ঢুকে সান্ত্বনার প্রথম লক্ষ্য ছিল টাকা জমানো—মাসে মাসে প্রায় একশ'টা করে টাকা জমা দিত প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে। আটদশ বছরে জমা হয়ে গেলো কয়েক হাজার টাকা। আর সেই জমানো টাকার খবর কেরাণীমহলে অজানা রইল না। শুধু তাই নয়, সান্ত্বনা সেই টাকাটার অঙ্কের কথাটা মাঝে মাঝে আশপাশের ছ'চারজনকে শুনিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ বোধ করে নি। যারা ওর দিকে ফিরে তাকাতো না, তারাও ঐ জমানো টাকার অঙ্কটা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা কম করতো না। ছ'চার জন সান্ত্বনার সঙ্গে আগের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে অফিসের ফাইল ছাড়াও অন্য কথা বলতে স্বরু করলো। যতোটা অস্বন্দর মনে হতো সান্ত্বনাকে ততোটা অস্বন্দর আর মনে হলো না অনেকেরই—এমন কি মাঝে মাঝে অফিসের ছ'চার জন এসে ওর সঙ্গে অ-দরকারী কথা বলতো। যৌবন প্রারম্ভে অফিসে ঢোকার সময়ে সান্ত্বনা ছিল একা, নিঃসঙ্গ, অনাড়ম্বর। প্রায় যৌবন-প্রান্তে সেই সান্ত্বনা সম্বর্দ্ধনা পেতে লাগলো যৌবনের। তার মধ্যে পরিতোষ নামে একটা ডগমগে যৌবনের ছেলে যেন বেশি খাতির জমিয়ে ফেলেছিল সান্ত্বনার সঙ্গে। অন্য অফিসের কাজ করতো পরিতোষ—প্রায়ই আসতো ঠিক ছুটি হাওয়ার আগটাতে, অপেক্ষা করতো গেটের সামনে সান্ত্বনার জন্যে। মাস ছুই-তিন এই রকম চললো। সান্ত্বনার দেহে পাড় বসানো সাদা শাড়ীর বদলে রঙীন শাড়ী উঠলো। সকলে ভাবলো হিল্লে হলো একটা মেয়েটার—কেউ কেউ ঈর্ষান্বিত হয়েও উঠলো। বৃদ্ধ

শ্রীধর বাবু সান্ত্বনাকে একটু ডেকে নিয়ে বললেন, একটু বুঝে শুনে চলো মা।

তারপর সান্ত্বনার নিয়মে কিছু ব্যতিক্রম ঘটতে লাগলো—যে ছিল রেগুলার আর পাংচুয়াল, সর্দি-কাশি-মাথা ধরা যার ধার কাছ দিয়ে যেতো না, সেই সান্ত্বনা পরপর সাতদিন এলো না। সকলেই উস্‌খুস্ করে। শেষে একদিন সান্ত্বনা এলো অফিসে। একটা দুটো ফাইল নাড়াচাড়া করে টেবিলের ওপর হাত দুটো রেখে ঘাড় গুঁজে রইল; সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। শেষে শ্রীধরবাবু গেলেন, সান্ত্বনার মাথায় হাত রাখলেন, সান্ত্বনা একবার মুখ তুলে চাইলো আর তারপরেই হু-হু করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো সান্ত্বনার চোখ থেকে দুই শুক্‌নো গাল বেয়ে।

শ্রীধর বাবু মাথায় হাত বুলোতে থাকেন ধীরে-ধীরে।

—আমার সব নিয়ে গেছে কাকাবাবু, স-ব। এই ক'টি কথাই বার বার বলেছিল সান্ত্বনা। টাকা দেখিয়ে চাকুরে মেয়ে বর ধরতে গিয়েছিল, টাকাও গেছে, বরও জুটলো না। তারপর থেকে আরও অনেক রোগা হয়েছে সান্ত্বনা, আরও অনেক খড়ি-ওঠা কালো। আরও অ-নে-ক নীরব। এবং কুঁজো হয়ে গেছে।

অফিসের পোষাক পরে সুদেষ্ণার সান্ত্বনার কথা মনে হলো। সকালের সুরের সঙ্গে তাল রেখে অনেক বেশি সেজেছে সুদেষ্ণা। রেনুকা একদিন বলেছিল, অতো সাজিস নে, পরে পস্তাবি।—সে কথার উত্তর দেয় না সুদেষ্ণা। ঠাট্টা করেই আর একদিন রেনুকা বলেছিল, সান্ত্বনার দশা হবে তোর।—তার উত্তরে সুদেষ্ণা পুরুষের মতো বুক টান-টান করে বলেছিল, হয় যদি হবে, তাই বলে কি এখন থেকে বুড়ি হয়ে থাকবো?

না, বুড়ি হয়ে থাকবে না সুদেষ্ণা, বুড়িয়ে যাবে না ঠিকই দিদির মতো। কী না ছিল শোভনার, সুদেষ্ণা ভাবে। তারও চেয়ে শোভনা অনেক বেশি সুন্দর—সুদেষ্ণা ত' কালো, শোভনার অমন সুন্দর রঙ পেলে সারা পৃথিবীর যৌবনকে আঁচলে গেরো দিয়ে রাখতে পারতো। কিন্তু দিদির জীবনে প্রেমই এলো না কোনও দিন। আশ্চর্য হয়ে যায় সুদেষ্ণা এমন নিঃপ্রেম জীবন কোন মেয়ের হতে পারে ভাবতেই পারে না সে। সুদেষ্ণার মনে আছে একবার বাবার এক বন্ধুর ছেলে বাড়ীতে বেড়াতে এসেছিল, মা-ই

শোভনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। পর পর ক'দিন ছেলেটি এসেছিল তাদের বাড়ীতে; তারপরে একদিন দু'বোনে যখন গল্প করছে কলেজের—তখন এলো; অনেকক্ষণ একথা-সেকথার পরে দিদিকে জিগ্যেস করলো, বি, এ তো পাশ করলেন, এবারে কী করবেন?

—মাষ্টারী করবো,—দিদি বোধ হয় কিছু না ভেবেই উত্তর দিয়েছিল।

—মাষ্টারী। বিস্মিত হয়েছিল সুচন্দ্র।

—কেন, খারাপ কি?

—খারাপ আর কি।—তারপর থেকে আর কোনও দিন আসেনি সুচন্দ্র। অথচ সুদেষ্ণা বুঝতে পেরেছিল সুচন্দ্রর চোখ দেখে শোভনার মধ্যে সে যেন কী খুঁজেছে। কিন্তু শোভনা বুঝতেই পারলো না। হাতের ফাঁক দিয়ে গলে গেল পরশ-পাথর। ভ্রুক্ষেপ নেই শোভনার।

সুদেষ্ণা তেমন মেয়ে নয়, পরশ-পাথর কেন, যে-কোনও পাথর সে আঁচল পেতে তুলে রাখবে। যখন অশোক ঘন-ঘন আসতো, রোজ আসতো তেমনি একদিনে সন্ধ্যেবেলা ছাদে গিয়ে দেখে ছাদের আলসে ধরে দাঁড়িয়ে শোভনা কাঁদছে। চকিত হয়ে সুদেষ্ণা জিগ্যেস করেছিল—কী হয়েছে রে দিদি, কাঁদছিস কেন? কী হয়েছে বল।

ভিজে চোখে শোভনা তাকিয়েছিল ওর দিকে। অনেকক্ষণ তাকিয়েছিল।

—কী হয়েছে বলবিনে?

—কিছু না,—শোভনা কাটিয়ে দিতে চেয়েছিল সুদেষ্ণার সন্দিগ্ধ প্রশ্ন।

—না, বল কি হয়েছে। কিছু একটা হয়েছে তোর।—সুদেষ্ণা নাছোড়বান্দা হয়ে ওঠে।

—অশোক তোকে তখন কী বলছিল রে। খুব নরম স্বরে প্রশ্ন করে শোভনা।

—কখন? কী বলছিল?—সুদেষ্ণা অশোকের কথাগুলো হাতড়াতে থাকে।

—ঐ যে বলছিল।

—কী,—সুদেষ্ণা উৎসুক হয়ে ওঠে।

—ঐ যে বলছিল, 'তোমার নাম আমার সব কাজে প্রেরণা দেয়, তুমি—তুমি জানতে পারো না।' আমাকে তো কেউ এমন করে কোন দিন বললে না।—বলেই শোভনা দ্রুত সিঁড়ির অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

সুদেষ্ণার বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস পড়লো। শোভনা তো জানে না, অশোকের ঐ কথাগুলো সুদেষ্ণার উদ্দেশ্যে নয়, গীতাকে কী বলবে অশোক তারই রিহার্সাল দিচ্ছিল সুদেষ্ণার কাছে। অশোকের কথাগুলো সেদিন একভাবে বেজেছিল সুদেষ্ণার, আর শোভনার কথা শুনে বক্ষের দরজায় নতুন করে দুঃখের রথ থামলো। মনে হলো সে যেন কোন অতি-বিশিষ্ট কোন বাপ-মায়ের অবৈধ সন্তান, ডাষ্টবিনের পাশে পড়ে কেঁদে কেঁদে বহু লোকের কৃপা-করুণা কুড়োচ্ছিল, হঠাৎ জীবনবাবু নিয়ে এসে মানুষ করেছেন। অশোকের চলে যাওয়ার পরে জীবন সম্পর্কে এক অতিসূক্ষ্ম নিস্পৃহতা দেখা দিয়েছিল সুদেষ্ণার—ভাবনাগভীর দুঃখ বোধের যাতনা দেখা দিয়েছিল। কী যে সে চায়, কী যে তার মনোগত বাসনা, তা সে নিজেও যেন জানতো না। শুধু জানতো কোন একজন তার জীবনে আসবে তাকে লুঠ করে নিতে, নিঃশেষে উজাড় করে দেবে সুদেষ্ণা তখন তাকে নিজের উত্তপ্ত যৌবনের সম্ভার।

সবে অফিসে পৌঁছিয়ে চেয়ার টেনে নিয়ে বসেছে সুদেষ্ণা, অ্যাকাউন্ট্যাণ্ট দেবনারায়ণবাবু ডাকলেন—মিস্ রায়, পেনসন-ফাইলটা নিয়ে আসুন তাড়াতাড়ি।

সুদেষ্ণা একবার তাকায় দেবনারায়ণবাবুর দিকে, তারপর ধীরে সুস্থে ফাইলটা নিয়ে গিয়ে তাঁর পাশের চেয়ারটায় বসে কাজটা বুঝিয়ে দিয়ে সই করার জায়গাটা দেখিয়ে দেয়। এমন বিশ্রী লাগে সুদেষ্ণার। অফিসে আসতে-না-আসতেই, সই করেছে-কি- করে নি, এক গ্লাস জল পর্যন্ত খেয়েছে কি-খায় নি, অমনি নিয়ে এসো ফাইল, বার করো অ্যাবসট্যাক্ট, ইস্যু করো অফিস-অর্ডার। মাঝে মাঝে মনে হয় এর থেকে ঘানিটানা ভালো, কিংবা ঠেলাগাড়ী চালানো, নিদেন নার্সের কাজটাই বা খারাপ কি। সুদেষ্ণা ভাবছে কতোক্ষণে শেখরের সঙ্গে দেখা হবে, কতোক্ষণে বাবার আজকের কথাগুলো বলতে পারবে, একটা এনগেজমেণ্ট করবে নিরিবিলি একান্তে দেখা করার, তা নয়, এই এক মাঝবয়সী অ্যাকাউন্ট্যাণ্টের পাল্লায় পড়ে সকাল থেকেই প্রাণান্ত।

অভয়বাবু যেন সুদেষ্ণার চিন্তার সূত্রটা অনুধাবন করতে পারেন নিজের সিটে বসেই, ওর দিকে মুচকে একটু হাসেন, সুদেষ্ণার চোখোচোখি হয়ে যায় অভয়বাবুর সঙ্গে। অভয়বাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে আসেন দেবনারায়ণ

বাবুর কাছে। দেবনারায়ণ ত' অভয়বাবুর কাছেই কাজ শিখে আজ পরীক্ষায় পাশ করে অ্যাকাউন্ট্যান্ট হয়েছেন। তাই বলে তখনকার সে খাতির নষ্ট হয় নি। দেবনারায়ণবাবু অভয়বাবুর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকান।

—দেবনারায়ণ, এ তোমার কেমন ধারা? মিস্ রায় এই মাত্র এলেন, এখনও জলস্পর্শ করেন নি, আর তুমি কিনা ফাইল আনতে বললে? একটু দম নেবার টাইম দেবে তো!

দেবনারায়ণবাবু হাসলেন শুধু, কথা বললেন না।

সুদেষ্ণা কাজ বুঝিয়ে দিয়ে নিজের জায়গায় এসে বসলো। দম নিয়ে ঢক-ঢক করে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খেয়ে ফেললো।

কতোক্ষণ কেটে গেল শেখরের পাত্তা নেই। উথাল-পাতাল করে সুদেষ্ণা। টিফিনেরও অনেকটা দেরি। একবার ভাবলো ঘুরে আসে শেখরের সেকশনটা, পরক্ষণেই ভাবলো, গরজটা কি কেবল তার একার, শেখরেরও তো গরজ হওয়া উচিত। ও যদি না এসে থাকতে পারে তবে সেই বা পারবে না কেন। দেখা যাক না আর কিছুক্ষণ।

আরও ঘণ্টা-খানেক কেটে গেল, তবু শেখরের দেখা নেই; অন্যদিন এরই মধ্যে দু'দুবার ঘুরে যায় সুদেষ্ণাদের সেকসনটা, একবার এসে সুদেষ্ণার পাশে চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে, আর একবার অন্য কারো কাছে, অন্য কারো সন্ধানে। কিন্তু সুদেষ্ণা জানে, এটা তার ছল, আসলে ওকে দেখতেই আসে, চোখে চোখে কথা বলে যায়। প্রথম-প্রথম যখন চন্দ্রশেখর—সুদেষ্ণার কাছে ও শুধুই শেখর—ওর পাশে চেয়ার টেনে নিয়ে বসতো তখন সুদেষ্ণা ভাবনায় অসাড় হয়ে যেতো, এই বুঝি কেউ কোন 'ভালগার' মন্তব্য করে বসে। কিন্তু দেখলো না, ছেলেটার ক্ষমতা আছে, ওর সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য কেউ করে না, যে-কোন মেয়ের পাশে গিয়ে বসে ঘণ্টার পর ঘন্টা গল্প করে গেলেও বোধহয় কেউ কিছু বলবে না শেখরকে, সন্দেহ পর্যন্ত করবে না, এ একেবারে পরীক্ষিত সত্য। ছেলেটা যাদু জানে।

যাদু-ই জানে শেখর, না হলে লোয়ার ডিভিসন কেরানী, চোখে পড়ার মতো চোখ দুটো ছাড়া আর যার কোন রূপ বা গুণ নেই সে কেমন করে সুদেষ্ণার মনের ভিতরে অতোখানি জায়গা জুড়ে নিলো।

রেণু—রেণুকা সুদেষ্ণার ভাব-গতিক দেখে হাসে।

—কী আছে ছেলেটার যে তুই অতো প্রশ্রয় দিস—প্রশ্ন করে মাঝে মাঝে রেণু।

সুদেষ্ণা কোন কথা বলে না, শুধু চোখ দুটো ওর আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ; মাঝে মাঝে বলেও ফেলে, ভারী সুন্দর কথা বলে কিন্তু শেখর।

—শেখর! চন্দ্রটা বুঝি বাদ দিয়ে দিয়েছিস ? তা দিল কে—তুই না, ও ?

এ-কথারও জবাব দেয় না সুদেষ্ণা। হৃদয়ের যে রহস্য তা কি কোন যুক্তির পক্ষে ভেদ করা সম্ভব! ও বলে, কী জানি কখন অজান্তে বাদ দিয়ে ফেলেছি।

রেণু চট করে ওর বুকের মাঝখানটায় হাত দিয়ে বলে, দেখি-দেখি, অজান্তে কখন আবার হৃদয়টা দিয়ে ফেললি কি না!

তারপরে দু'জনেই হেসে ওঠে।

এ রকম আলোচনা রোজ না হলেও প্রায়ই হয়। সুদেষ্ণার শ্রান্তি আসে না, রেণু ওর বেশি এগুতে ভরসা পায় না বলেই বোধ হয় প্রায় একই রকমের রসিকতা করে। রেণু আবার এ-ও বলে—বলি, এই প্রথম না এই শেষ ?

সুদেষ্ণার বুকের মধ্যে ধ্বক্ করে ওঠে—এই শেষ হলেই ত সে বেঁচে যায়। মুখে বলে, শেষ কি কেউ বলতে পারে ?

বলে বটে কিন্তু কথাগুলো কেমন জড়িয়ে যায়, ঠোঁট দুটোই কেবল নড়ে ওঠে। রেণু খিল খিল করে হেসে ওঠে। সুদেষ্ণার হাসি আসে না। হাসতে গিয়েও কেমন গম্ভীর হয়ে যায়।

মনের ভেতরে এই সব ভাবনার জাল বুনতে বুনতে কাজ চলে আর মাঝে মাঝে ঘড়ির দিকে তাকায়। টিফিনের আর বেশি দেরি নেই, অথচ একবারও শেখর এলো না আজ। মনে হলো, হয়ত অফিসেই আসে নি, মাঝে মাঝে আসে না শেখর। অসুখ-বিসুখ করতে পারে। সুদেষ্ণা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো, একবার শেখরদের সেকসন্টা ঘুরে আসতে হবে, কিংবা ওই ঘরের পাশ দিয়ে চলে আসবে।

ঘর থেকে বেরুতে যাবে, পিছন ফিরে দেখে দেবনারায়ণবাবু ওর দিকে নির্ণিমেষে চেয়ে আছেন। দ্বিরুক্তি না করে বেরিয়ে পড়লো সুদেষ্ণা।

ওর অনুমানই সত্য, শেখর আসে নি।

শেখরদের সেকসন্ থেকে বেরুতে যাচ্ছে এমন সময়ে রেণু সামনে পড়ে গেল।

—সু, স্মৃতিদিকে দেখেছিস ?

—কেন রে ?—সুদেষ্ণা পাল্টা প্রশ্ন করে।

—একটু দরকার ছিল, টিফিনের ঘরে বলবোখন, এখন যাই ছোকরা অ্যাকাউন্ট্যান্টটা আবার গজর গজর করবেখন, একেই ত আমাদের মেয়েদের কাজ না করার বদনাম আছে। বলেই হন হন করে চলে গেল রেণু।

হয়ত অত তাড়াতাড়ি না চলে গেলেও পার্‌তো রেণু; কিন্তু সুদেষ্ণাকে এড়িয়ে গেল সে, স্মৃতির কাছ থেকেও বোধ হয় সে টাকা ধার করবে। তার কাছ থেকে ধার চাইবার মুখ নেই রেণুর।

সুদেষ্ণা ফিরে আসে নিজের সিটে। কেমন একটা তালগোল পাকিয়ে যায় তার। এটা সে লক্ষ্য করেছে শেখর যেদিন আসে না, কেন জানি স্মৃতিকেও সেদিন অফিসে দেখা যায় না। দু'জনে এমন আকস্মিকভাবে অনুপস্থিত হয়ে যায় যে যেকোন অন্যমনস্ক লোকের পক্ষেও একটা যুৎসই গোপন যোগাযোগ থাকার সন্দেহ করা সম্ভব। মনটা বেজার হয়ে যায় সুদেষ্ণার। কি সুন্দর সকালটা দিয়ে সুরু হয়েছিল দিনটা, এখন যেন কে তার মাথার ওপর এক বালতি বরফ-গলা জল আস্তে আস্তে ঢালছে সকালবেলার সুদেষ্ণা যেন মিইয়ে আছে।

স্মৃতিকে সুদেষ্ণার ভালো লাগে না—সহ্য করতে পারে না। কেন ভালো লাগে না, কেন সহ্য করতে পারে না তার কোন সুষ্ঠু সঙ্গত কারণ সুদেষ্ণা দেখাতে পারে না। তাই রেণু বলে, আসলে তুই স্মৃতিদিকে ঈর্ষা করিস।

—ঈর্ষা করি! আমি! কেন, কিসের জন্যে ?

—স্মৃতিদি তোর চেয়ে দেখতে সুন্দর, শেখরবাবুর সংগে স্মৃতিদির বেশ খাতির, এইসব কারণে আর কি।

—শেখরের সঙ্গে তোরও কম খাতির না, আর আর মেয়েদের সঙ্গেও তার যথেষ্ট ভালো পরিচয় আছে, তাহলে তোদেরও আমি ঈর্ষা করি বল ?

রেণু কথা বলে না, গম্ভীর হওয়ার ভান করেও হেসে ফেলে।

তবু সুদেষ্ণার স্মৃতিদিকে ভালো লাগে না। স্মৃতি বিবাহিতা; কিন্তু স্বামীর সংগে বনিবনা না হওয়ায় চলে এসেছে স্বামীর ঘর ছেড়ে, তবে

এখনো এয়োতির চিহ্ন মাথায় বহন করে। সুদেষ্ণা আরও শুনেছে, স্মৃতির স্বামী এখনো নাকি মাসে মাসে কতো টাকা খোরপোষ দেয়। নিতান্তই বিয়ের আগে আই. এ. টা পাশকরা ছিল তাই এখানে একটা চাকরী জুটিয়ে নিতে পেরেছে। না হলে কী করে যে স্মৃতি সময় কাটাতো ভেবেই পায় না। অফিসের বড় কর্তাদের ওপর চটে যায় সুদেষ্ণা—বেছে বেছে সান্ত্বনা, স্মৃতি এদের চাকরী না দিলে দেশের কী ক্ষতি হতো, চাকরী দিয়েই বা কোথায় দেশের কতোখানি উদ্ধার লাভ ঘঠেছে !

—মিস রায়, শুনুন।

দেবনারায়ণবাবুর ডাকে সুদেষ্ণার চমক ভাঙে। সুদেষ্ণা কিন্তু বিরক্ত হয় না, একটা কিছু কাজ করতে পেলে যেন বেঁচে যায় ; টিফিনের সময় হয়ে গেছে কখন, রেণু তারা হয়ত তাকে না দেখতে পেয়ে হয়ত এখ্‌খুনি ওপরে উঠে আসতে পারে ; কিন্তু ওর আর টিফিন ঘরে যাওয়ার পরিশ্রমটুকু করবার কোন ইচ্ছেই নেই, শক্তি নেই। না, সুদেষ্ণা হতাশ হয়ে পড়ে নি, ভেঙে পড়ে নি ; এমনি কখন-কখন এক ধরণের আলসেমি ঘিরে ধরে সমস্ত দেহ-মন যখন আর হাত-পা গুলোকে নাড়াচাড়া করার উৎসাহটা আসে না, এবং বসে বসে একথা-সেকথার রোমন্থন করতে ভালো লাগে কোন দিকে বিশেষভাবে না তাকিয়ে, এ যেন কতকটা চোখ মেলে থেকে তন্দ্রার সুখ উপভোগ করা, ট্রামে-বাসে জানলার ধারে বসে কোন-কিছুর দিকে না তাকানোর নিশ্চিন্ত আরাম বোধ করা।

—মিস রায় !

আবার ডাকলেন দেবনারায়ণবাবু।

--যাই স্যর। অনুচ্চকণ্ঠে উত্তর দেয় সুদেষ্ণা। তাকিয়ে দেখে ঘর প্রায় খালি,—এখানে সেখানে দু-চারজন বসে আছে, কেউ কাজ করছে, কেউ অফিসে বসে বাড়ী-থেকে-আনা টিফিন খাচ্ছে। সে অ্যাকাউণ্ট্যাণ্টের বাঁ-হাতি চেয়ারটায় গিয়ে বসে আস্তে আস্তে।

—হাতে ত আপনার বিশেষ কাজ নেই, না—কেমন ফিস্‌ ফিস্‌ করে যেন কথা বলেন দেবনারায়ণবাবু, সুদেষ্ণা ওঁর গলায় যেন কিছু একটা গোপন করার ফিস্‌ফিসানি শুনতে পায় ; একটু দেবনারায়ণবাবুর দিকে তাকিয়ে নেয়।

—না স্যর, তেমন জরুরী কোন কাজ নেই।

—তবে এই চিঠিটা আজকের মধ্যে ডিসপোজ অফ করে দিন, অবিশ্যি আজিকে না দিলেও ক্ষতি নেই, কাল ফার্ষ্ট আওয়ারে দিলেই চলবে।

—না-না, আমি আজই ড্রাফ্‌ট করে আনছি,—সুদেষ্ণা বলে। বলেই চিঠিটা নিয়ে উঠতে যায়। দেবনারায়ণবাবু হাসেন, খপ করে বাঁ হাত দিয়ে সুদেষ্ণার ডান হাতটা চেপে ধরেন, সুদেষ্ণা বিস্মিত হওয়ার আগেই দেবনারায়ণ বাবু হাত ছেড়ে দেন, একটু যেন লজ্জিতই হন। সুদেষ্ণা হয়ত অজ্ঞাতসারে হাতটা সরিয়ে নিতে গিয়েছিল, কিন্তু নিল না; বরং দেবনারায়ণ বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলো, পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে দেখলো, যে লোকটাকে রোজ দেখে তাকে যেন আজ প্রথম চিনতে পারলো; লোহা রঙের চুল, আ-কামানো দাড়িতে একটু একটু সাদার ছোঁয়া লেগেছে, বয়েস পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চান্নর মাঝখানে কোথাও হতে পারে, বলিষ্ঠ দেহ যৌবনে শক্তি-সম্ভাব্যতার কথা মনে করায়। সুদেষ্ণাকে তিনি জোর করে ধরতে চান নি, তবু দেবনারায়ণবাবুর কব্‌জিতে যে যথেষ্ট জোর আছে, তা সামান্য স্পর্শে বুঝতে পেরেছে সুদেষ্ণা। শেখর তলোয়ারে মতো বা চাবুক-চেহারা, দীর্ঘ-দীপ্তি; দেবনারায়ণবাবু শক্তিভূয়িষ্ঠ। হঠাৎ মনে হলো সুদেষ্ণার দেবনারায়ণ বাবু একটু যেন 'গ্রস'। আর মনে হলো এক লহমায় অ্যাকাউন্ট্যান্ট দেবনারায়ণ বাবু আসলে মানুষ একটা। অফিসে প্রথম প্রথম ঢুকে সুদেষ্ণার মনে হয়েছিল, অ্যাকাউন্ট্যান্টরা আলাদা জাতের, আলাদা জগতের মানুষ, তারা হাসে না, হাসতে জানে না, তারা রামগরুড়ের ছানা, যদি কখনও তারা হাসে, তবে সে হাসিকে মুচকি হাসি বলা চলে, দেঁতো হাসি, কাষ্ঠ হাসি বলা চলে, কিন্তু কখনও সেটা হাসি নয়। বাবা অফিসার ছিলেন, হাসতেন কম, কথা বলতেন কম; তার কারণ সুদেষ্ণা অফিসে কেরাণীগিরি করতে না ঢুকলে হয়ত অনুধাবন করতে পারতো না। দেবনারায়ণবাবুকে গোড়া থেকে সে সেই রকমই দেখে আসছে, প্রিয় বন্ধু অভয়বাবুর সঙ্গেও তিনি সেইভাবেই কথা বলে আসছেন, এটা সে লক্ষ্য করেছে। কিন্তু আজ এইক্ষণে মানুষ দেবনারায়ণ বাবুর চেহারাটা তার কাছে স্বচ্ছ হয়ে গেল।

এতোখানি ভাববার হয়ত সময় পেতো না সুদেষ্ণা যদি না দেবনারায়ণ বাবু লজ্জা-আরক্তিম মুখখানাকে অনাবশ্যকভাবে অ-দরকারী চিঠির মানে খুঁজবার জন্যে প্রয়োজনাতিরিক্তভাবে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়তেন, নীরব

থাকতেন। আবার সেই সঙ্গে আত্মমর্যাদার যে স্বাভাবিক শোভা আছে, এবং তা সুদেষ্ণা রক্ষা করতে জানে সেই কথাটাও এই মুহূর্তে বেশি করে মনে করলো, তাই বলে ফেললো—কী বলছেন?

কথাটার ওপর বোধ হয় একটু জোর দিয়ে ফেলেছিল সে, দেবনারায়ণ বাবু মুখ তুলে দেখলেন, এই বলছিলাম, মানে, আপনার হাতে সময় তো আছে যথেষ্ট। একটু বসুন না।

—হাঁ, এখন আর তো কাজ নেই, সব তুলে দিয়েছি, কেবল ঐ চিঠিটাই বাকি রইল,—বলে সুদেষ্ণা টেবিলের ওপর পড়ে থাকা চিঠিটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

—সে হবে'খন।

দেবনারায়ণবাবু আবার একটুক্ষণ চুপ করে থাকেন। সুদেষ্ণা যেন একটু গা ছেড়ে দিয়ে চেয়ারটায় সহজ হয়ে বসে। আর অপেক্ষা করতে থাকে দেবনারায়ণবাবুর পরবর্তী কথার।

—শুনেছেন বোধ হয় আপনার বন্ধুর বিয়ে?—খুবই আস্তে অনুচ্চস্বরে দেবনারায়ণবাবু প্রশ্ন করেন; বোধ হল একজন কেরানী, বিশেষ করে একটি মেয়ের কাছে এই ধরনের কথা বোধ হয় তিনি প্রথম বললেন, নবপরিণীতার-দায়ে-পড়ে পরপুরুষের সঙ্গে প্রথম কথা বলার মতো।

—কার বিয়ে? কার সংগে?—দ্রুত প্রশ্ন করে সুদেষ্ণা। ওর প্রশ্ন করার ভঙ্গি ও দ্রুততা দেবনারায়ণবাবুকে চকিত করে দেয়।

—মিস দাসগুপ্তর, রমা দাসগুপ্তর। কেন শোনেন নি?

—ওঃ, হাঁ, জানি। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সুদেষ্ণা।

রমা দাশগুপ্তর সঙ্গে কার বিয়ে হচ্ছে শীগ্‌গির সুদেষ্ণা তা জানে। অনিল ছেলেটাকে চেনে সে, বিলক্ষণ চেনে। একবার গায়ে পড়ে আলাপ করতে এসেছিল; রোয়াকে বসে আড্ডা দিতে দিতে বাপের দৌলতে অফিসে এসে কেরাণী হয়ে বসেছে। অনিলের বাবা শৈলবাবু সম্বন্ধে অফিসে মজার গল্প চালু আছে। সে গল্পও সুদেষ্ণা জানে, সবাই জানে। অভয়বাবু সাড়ম্বরে সে গল্প সকলকে বলেছেন। একবার, শৈলবাবুর প্রথম চাকরী-জীবনে, যখন যে কোন বড় ছুটির আগের দিনটিতে অনেকের চাকরী যেতো, আবার ছুটির শেষ দিনটিতে চাকরী হতো সেই সময়ে শৈলবাবুর চাকরী বদলীর আদেশ হলো, নাগপুরে যাওয়ার আদেশ হলো। শৈলবাবু মহা

ফাঁপরে পড়লেন। বড় সাহেব তখন খাস ইংলণ্ডের লোক, তাঁকে গিয়ে ধরা অসম্ভব ব্যাপার, ধরা মানে যদি পায়ে ধরা হয় তাহলে শৈলবাবুর আপত্তি নেই, পায়ে তার কারণটাও ত' ইংরেজিতে বলতে হবে, সেইখানেই যতো মুস্কিল। তাছাড়া সাহেবের মেজাজ নাকি সব সময়েই এমন একটা পর্যায়ে তোলা থাকে যে শৈলবাবুর মতো কেরাণীর ত' কথাই নেই, মেজ বা মাঝারী গোছের সাহেবরাও তাঁর কাছে যেতে বার-তিনেক ঢোক গেলেন। তখন সবাই মিলে পরামর্শ করলেন, ঠিক হলো, সাহেবের বাড়ীতে গিয়ে সাহেব যখন থাকবে না তখন মেমসাহেবকে গিয়ে শৈলবাবু ধরবেন, কানাইবাবু সঙ্গে যাবেন শৈলবাবুর সাহস জোগাবার জন্যে। যথা পরামর্শ কাজ। গুটিগুটি কানাইবাবু আর শৈলবাবু বিকেলে সাহেবের বাড়ী গেছেন। গিয়ে দেখেন লন-এ একজন মেমসাহেব কুকুর নিয়ে পায়চারী করছেন। কানাইবাবু হাঁকলেন, শৈল, মা তারা বলে ঢুকে পড়। শৈলবাবু একেবারে হুম্‌ড়ী খেয়ে গিয়ে পড়লো, মুখে কেবল বলে যাচ্ছেন, ম্যাডাম্ দিস ইজ দি রাইপ্ টাইম্, সাহেব ইজ অ্যাবসেণ্ট। মেম যতো পেছনে হটে যান, শৈলবাবু ততোই চীৎকার করেন, ম্যাডাম্ দিস্ ইজ দি রাইপ্ টাইম্, সাহেব ইজ অ্যাবসেণ্ট। এক বাঙ্গালীবাবুর ঐ কাণ্ড দেখে মেমসাহেব ত' ইংরেজি মতেই চীৎকার জুড়ে দিয়েছেন, বয়-বেয়ারা-খানসামা যে সেখানে ছিল ছুটে এসে শৈলবাবুকে গেটের বার করে দিল। এ গল্প শুনতে শুনতে সুদেষ্ণা হাসি চাপতে পারে নি। অনিল সেই শৈলবাবুর ছেলে, বাপ কা বেটা। অনিল চাকরী রক্ষা করতে জানে। এই সেদিন কী একটা হরতালের সময়ে ট্রাম কণ্ডাক্টারের য়ুনিফর্ম পরে সে হাজিরা দিয়ে গেছে। সেই অনিলের সঙ্গে রমা দাসগুপ্তের মতো মেয়ের বিয়ে, রুচিতে যে কোথায় মেলে সুদেষ্ণা ভেবে পায় না। ওর অজান্তে একটা দীর্ঘ নিশ্বাসই পড়ে।

—কী হলো ?—সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন দেবনারায়ণবাবু।

—না, কিছু না।—সুদেষ্ণা সহজ হতে চেষ্টা করে।

—যাচ্ছেন ত' বিয়েতে ?

—দেখি, সময় হবে না হয়ত।—সুদেষ্ণার বিরক্তি লাগে, এটা কী এমন কথা যে জন্যে হঠাৎ দেবনারায়ণবাবু তার সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা করেছেন। বিরক্ত হয়, বিস্মিত হয়ও। দেবনারায়ণবাবুর কী ইনটারেষ্ট থাকতে পারে ভেবেই পায় না।

টিফিনের সময় শেষ হয়ে গেছে কখন। ঘরে লোকজন ঢুকতে সুরু করেছে। অভয়বাবু সিগারেট টানতে টানতে ঘরে ঢোকেন। সুদেষ্ণা আস্তে আস্তে নিজের জায়গায় এসে বসে দেবনারায়ণবাবুর টেবিলের ওপর থেকে চিঠিটা তুলে নিয়ে, দেবনারায়ণবাবুকে জিগ্যেস করার কোন প্রয়োজনই বোধ করে না। কিন্তু অফিসের মেয়েদের সম্বন্ধে যে দেবনারায়ণবাবুর আগ্রহের কোন অভাব নেই, বরং আর পাঁচ-দশজনের মতো যথেষ্ট আছে, হয়তো নিজেদের মধ্যে মেয়েদের নিয়ে রসালাপ যে করেন সেটা জানতে পেরে সুদেষ্ণা কোথাও যেন একটা তৃপ্তির স্বাদ পায়।

নিজের সিটে এসে চিঠিখানা মেলে ধরে প্রয়োজনীয় ফাইল বার করতে থাকে। আজকের ডাক এখনও আসে নি, সুতরাং এই চিঠিটার জবাব আজ রেডি করে ফেলতে পারলে, আজকের ডাকের সামান্য যে কটা চিঠি আসবে তা কাল শেষ করে দিতে পারবে রয়ে-বসে।

—কী রে, কী এতো কাজ করছিস?—সুদেষ্ণার পিঠে হাত দিয়ে বলে রেণু।—টিফিন ঘরে গেলিনে যে বড়?

সুদেষ্ণা কোন উত্তর দেওয়ার আগে রেণু বলে ওঠে, চল বাইরে চল, দরকারী কথা আছে।

ঘড়িটা দেখে নিয়ে সুদেষ্ণা বেরিয়ে আসে রেণুর সঙ্গে।

—টিফিনের সময় গেলিনে যে? কী হয়েছে?

—কী আবার হবে? এমনি।

—এমনি, না মন খারাপ?

—মন খারাপ হতে কোথায় দেখলি তুই?

—আ-হা-হা, চটিস কেন?

—বা-রে চটলাম কোথায়?

—তা বেশ করেছিস, চটিসনি ভালো করেছিস। তা যাক, বলি কী ব্যাপার?—রেণু এমনভাবে কথা বলে যেন হঠাৎ আর্কিমেডিসের মতো একটা কিছু আবিষ্কার করেছে, কিংবা কোন গুপ্তধন পাওয়ার সন্ধান পেয়েছে।

—আবার কী ব্যাপার? মিনিটে-মিনিটে তোর কী ব্যাপারে'র ফয়সালা করতে বোধহয় ধুরন্ধর স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডও হার মানবে! কী হয়েছে, কী জানতে চাস তাই বল।

—বলবো? ঠিক বলছিস, নির্ভয়ে বলবো?

—ছেলেমানুষী রাখ দিকি! তোর সব তাতেই বাড়াবাড়ি।—সুদেষ্ণা বিরক্ত হওয়ার ভান করে।

আমার বাড়াবাড়ি, না তোর বাড়াবাড়ি?—রেণু কিছুতেই দমে না, অথচ ব্যাপারটা যে কী সেটাও সুদেষ্ণাকে বুঝতে দেয় না। সুদেষ্ণা দেখলো, রেণুর কথার উত্তর দিলেই ও আসল কথায় সারা দিনে সারা রাতে পৌঁছবে না। রেণুর এটা একটা মজ্জাগত স্বভাব। সুতরাং আর কথা না বাড়িয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

—ঠিক বলছিস নির্ভয়ে বলতে পারি?—রেণু আবার সেই একই প্রশ্ন করে।

—ভয় না করে তুই নির্ভয়ে বল। মোটকথা তাড়াতাড়ি বল।

—বলি, কী এমন কথা হচ্ছিল তোদের ঐ গোমড়ামুখো অ্যাকাউন্ট্যান্টের সঙ্গে ফিসির ফিসির করে? দু'দুবার এলাম, তা দেখি তুই তন্ময় হয়ে কথা বলে যাচ্ছিস। ব্যাপারটা কী?

—ওঃ, এই ব্যাপার! তা কী আবার হবে, একটা দরকারী চিঠি নিয়েই কথা হচ্ছিল, ওঁর কাছ থেকে পয়েণ্টস জেনে নিচ্ছিলাম।

—পয়েণ্টস জেনে নিচ্ছিলি? ফিস্-ফিস্ করে বুঝি আজকাল পয়েণ্টস জানতে হয়?

—সত্যি, পয়েণ্টস জেনে নিচ্ছিলাম।—সুদেষ্ণা কিছুতেই আসল কথাটা বললো না, কারণ, রেণুকে সত্যি বললে আধ ঘণ্টার মধ্যে রেণু দেবনারায়ণ বাবু সম্বন্ধে সব কথা অফিসের বাকি মেয়েগুলোকে বলে দেবে, এবং একটা মেয়ের কাছে পৌঁছলেই সেটা পুরুষমহলে পল্লবিত হয়ে রটে যাবে। এটা সে এতো ভালোভাবে জানে বলেই আসল ব্যাপারটা চেপে গেল। শেখরের সঙ্গে তার কথাবার্তা, তার ঘনিষ্ঠতার খবর রেণু এমনভাবে বলেছে যে সকলের ধারণা হয়েছে সুদেষ্ণার সঙ্গে শেখরের একটা মোটামুটি আণ্ডারষ্ট্যাণ্ডিং হয়ে গেছে, এখন বাকি শুধু উভয় পক্ষের উপযুক্ত সময় সুযোগ সুবিধা। এতে করে রেণু যে তাকে বেয়াড়া কোন অবস্থায় ফেলেছে তা-নয়, কিংবা এর পেছনে তার যে কোন মতলব কাজ করেছে তা-ও নয়, এইটেই রেণুর স্বভাব। হয়ত এই স্বভাবই তাকে একদিন পুরোদস্তর সিনিক করে দেবে। সেদিন হয়ত তার আজকের এই কাজ, এই স্বভাবের পেছনে কোন দুষ্ট মতলব আবিষ্কার করা কঠিন হবে না। সেদিন হয়ত রেণুকে সুদেষ্ণার ভালো লাগবে

না, হয়ত এড়িয়ে চলবে প্রাণপণে। কিংবা হয়ত আর রেণুর সঙ্গে তার যোগাযোগ থাকবে না, হয়ত দেখা সাক্ষাৎ হবে না, হলেও ন-মাসে ছ'মাসে একদিন, রাস্তাঘাটে, পথ চলতে কোথাও।

—কী রে, তোর কী ভাব লেগে গেল নাকি? চুপ করে রয়েছিস যে?

—একটা কথা ভাবছিলাম বটে।

—তা কথাটা কী?

—কথাটা অতি সামান্য, তবে তোর কাছে সামান্য না-ও হতে পারে।

রেণু যেন চিন্তিত হয়ে ওঠে, একটু উৎসুক হয়ে ওঠে।

—আমার কাছে সামান্য না হতে পারে কী এমন খবর যা তুই এতোক্ষণ আমায় বলিস নি?

—তেমন কিছু নয়। তবে তোর বন্ধুর বিয়ে, রমার।

—রমার? কার সঙ্গে?

—সেই যে অনিল বলে ছেলেটা তার সঙ্গে।

রেণুর মুখখানা যেন বিবর্ণ হয়ে গেল। সুদেষ্ণা জানতো, রেণু এ বিয়ের খবর শুনলে বেশ খানিকটে মুষড়ে পড়বে। ও ভেবেছিল, দেবনারায়ণবাবু যখন খবর পেয়েছেন তখন নিশ্চয়ই—রেণু সে খবর তার আগেই পেয়ে গেছে। হয়ত সেই কারণে মনের সেই ব্যথার খচখচানিটুকু ভুলে থাকবার জন্যে হয়ত রেণু ওর সাধারণ স্বভাব যা তারও চেয়ে বেশি দেখাচ্ছে, একটু বেশি উজ্জ্বল করে তুলতে চাইছে নিজেকে। কিন্তু সুদেষ্ণা কথাটার সূচনা করেই বুঝতে পারলো, রেণু এখনও শোনে নি, সুদেষ্ণার পক্ষে অথচ কথাটা বলতে গিয়েও থেমে যাওয়া যায় না, কারণ, রেণু খুব চালাক মেয়ে, কিছু যে সে এড়িয়ে যাচ্ছে সুদেষ্ণা এটা সে বুঝতে পারবে এবং তাতে মর্মান্তিক ক্ষুন্ন হবে, মুখে কিছু না বললেও। তাই যাতে মুষড়ে না পড়ে তার জন্যে অনিলের গুরুত্ব কমিয়ে দিতে অনিলের নামের সঙ্গে 'সেই ছেলেটা' শব্দ দুটি যোগ করে দিল সুদেষ্ণা।

ততক্ষণে রেণু যেন একটু সাম্‌লে নিয়েছে।

—তুই কার কাছে খবর পেলি?

—পেয়েছি।

—বল না। রমা তো ক'দিন আস্‌ছে না?

—সম্ভবত ঐ জন্যেই আস্‌ছে না।

—আচ্ছা, তুই যা, আমি এখন চলি। বলেই রেণু হন্-হন্ করে চলে গেল।

সুদেষ্ণা বুঝলো রেণু এখন একা থাকতে চায়। একা থাকাই তার দরকার। সুদেষ্ণাও নিজের সিটে চলে এলো। ঘরে ঢুকবার সময়ে একবার দেবনারায়ণবাবুর দিকে নজর পড়লো—চোখোচোখি হলো ওর সঙ্গে। কী আশ্চর্য, দেবনারায়ণবাবুর চোখেও ৲ন শেখরের চোখের ভাষা। সব পুরুষেরই কি একই চোখে, একই তাদের ভাষা। চোখে কী ওদের মনের মানচিত্র!

সিটে বসে মনের রাশ টেনে রাখতে পারলো না সুদেষ্ণা। চিঠিটা হাতে করে নিলো বটে, কিন্তু বার-কয়েক চেষ্টা করেও গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত চিঠিটা বার কয়েক মনে মনে পড়ে ফেলেও কোন মানে বের করতে পারলো না, ফিরে-ফিরে পড়লো চিঠিখানার প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি লাইন, কিন্তু তাতেও কোন অর্থ বোধগম্য হলো না। অথচ সে জানে একজন লোক দূর থেকে তাতে দেখছে, দেখছে নিবিষ্ট চিত্তে। হয়ত অন্যমনস্ক দেখলে ডেকে বসতেও পারে। সুদেষ্ণা দেবনারায়ণবাবুর কাছে ধরা পড়তে চায় না। তাই চিঠিটা এক হাতে নিয়ে আর এক হাতের উলটো পিঠের ওপর গালটা রেখে ভাণ করলো যেন সে চিঠিটা বিশেষ অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে অনুধাবন করার চেষ্টা করেছে।

মাথার মধ্যে সুদেষ্ণার রেণুর কথাটা ঘুরতে থাকে। রেণুকে ওর খুব ভালো লাগে। রেণুর একটা বর জুটুক, একটা ঘর হোক, এটা যেন সুদেষ্ণার প্রাথমিক কামনা। কোন-কোন মেয়েকে দেখলে, কুমারী মেয়েকে দেখলে, মনে হয় যেন তারা বিধবা। তাদের মুখে অবয়বে কোথায় যেন একটা কোন বিশেষ ভাব থাকে যা থেকে প্রথম নজরেই মনে হয় তার বিধবা, বিশেষ যদি তারা সাদা শাড়ী পরে। এটা শাড়ীর গুণে কিনা সুদেষ্ণা বলতে পারে না—কোন কারণ ব্যাখ্যা করতে বললে হয়ত সে আমতা-আমতা করবে; এটা নিছক তার ধারণা। মাষ্টারী করতে যাওয়ার পরে তো বটেই, আগেও শোভনাকে সুদেষ্ণার বিধবা বলে মনে হয়েছে। রেণুকে অফিসে প্রথমে দেখে ওর ঠিক ও'রকম মনে হয়েছে। সুদেষ্ণার দিদিমা বলতেন, ঐসব মেয়েদের কোনদিন বিয়ে হবে না, হলেও

সুখে ঘরকন্না ঐসব মেয়েরা করতে পারবে না, করার সুযোগ পাবে না।

রেণুকে সেই রকম মনে হয় সুদেষ্ণার, একে ত' সরু পাড় সাদা শাড়ী, তার ওপরে ওর সিঁথির দিকে তাকালে যে-কোন লোকেরই মনে হবে, এককালে হয়ত সিঁথিতে চওড়া করে সিঁদুর দিতো এয়োতির চিহ্ন হিসাবে, আজ যেন সিঁদুর মুছে ফেলার পরে চওড়া সাদা একটা দাগ কপালের এ প্রান্ত থেকে মাথার চুলের মধ্যে গিয়ে হারিয়ে গেছে, সিঁথিটা যেন জ্যোৎস্না রাতের নদীর বালির চড়ার মতো। রেণুকে যেন ঐ রকমটি ছাড়া ভাবা যায় না। পিসিমা কিন্তু একদিন রেণুকে দেখে বলেছিলেন সুদেষ্ণাকে, মেয়েটা অলক্ষুণে। কেন অলক্ষুণে সে ব্যাখ্যা জানতে চায় নি সুদেষ্ণা, পিসিমাও দেন নি। কিন্তু পিসিমার ঐ কথা শুনলে রেণুর বাবা-মা যে পিসিমার ওপর চটে যেতেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই সুদেষ্ণার, কারণ, সমস্তটা পরিবার য়ে রেণুর একশ' সাড়ে সাঁইত্রিশ টাকার ওপর। রেণুর বাবা একেবারে অন্ধ না হলেও চোখে এতো কম দেখেন যে লেখাপড়া ত' করতে পারেনই না, পাঁচ মিনিটের রাস্তা লাঠিতে ভর করে দেড় ঘণ্টায় চলেন। চোখ দুটো তাঁর যখন ভালো ছিল তখন একটা অফিসে প্যাকিং ডিপার্টমেণ্টে কাজ করতেন, প্যাকার ছিলেন, তাতে কৌলীন্য তাঁর যায় নি ; বরং কৌলীন্যের গোঁড়ামির জন্যে বড় মেয়ে মেনকার বিয়ে দিতে পারেন নি, এমন কি মেনকা নিজে একটা ছেলেকে পছন্দ করে মা-র মারফৎ বাবার কাছে আবেদন করেছিল, কিন্তু আবেদন রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, উপরন্তু মেনকাকে বেশ কিছুদিন মা-র চোখে চোখে থাকতে হয়েছে, তাতেও যখন মেনকাকে শান্ত করতে পারেন নি তিনি, তখন একদিন বেদম প্রহার করেছিলেন। ফলে পরের দিন মেনকাকে আর বাড়ীতে পাওয়া গেল না। রেণু বলে, এতে মার যতো দুঃখই হোক, বাবা কিন্তু দুঃখিত হন নি, দুঃখিত হন নি নয়, মুখচোখ দেখে মনে হয়েছে তিনি খুশিই হয়েছেন। সুদেষ্ণা জিগ্যেস করেছিল, কী করে বুঝলি ?

—বুঝলাম একটা ঘটনা থেকে ; অবিশ্যি এটা আমার একান্তই অনুমান, তবে অনুমানটা বোধ হয় একেবারে মিথ্যে নয়। কারণ, দিদিকে যেদিন সকালে পাওয়া গেল না, আমরা বাকি ক' ভাই-বোনে

মিলে আশপাশের বাড়ীতে খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে যখন ফিরে এলাম, ছোটো ভাই সন্তু যখন মামার বাড়ী, পিসিমার বাড়ী থেকেও ঐ একই সংবাদ নিয়ে এলো, তখন দেখলাম বাবা বাজার থেকে সেরখানেক ওজনের একটা ইলিশ মাছ কিনে আনলেন ; তুই জানিস মাছ তখন, আর এখনও, আমাদের পক্ষে বিলাসিতা। তাছাড়া, বাবা তারপর থেকে কোনদিনের তরেও দিদির নাম মুখে আনেন নি। মা-র চোখের জল চোখেই শুকিয়েছে।

এতোদূর বলে রেণু চুপ করেছিল, একটা প্রচণ্ড দীর্ঘশ্বাসে তখনকার মত বাতাসটা ভারী হয়ে উঠেছিল। এবং আরও খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিল, তুই শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবি, বেশ কিছু কাল পরে, তখন আমি ধারকর্জ করে, সেলাই শিখিয়ে, লোকের কাছে ভিক্ষে করে যখন আই-এ পড়ছি তখন কোথা থেকে একদিন বাবা প্রায় শ' দেড়েক টাকা নিয়ে এলেন, মুখে তাঁর হাসি ধরে না, সে-হাসি দেখলে শিউরে উঠতে হয়। পরে জেনেছি, বাবা দিদির খোঁজ পেয়েছিলেন, এবং জোর করে কী ভাবে তার কাছ থেকেই টাকাটা এনেছিলেন ; এখনও আনতে যাওয়ার কথা বলেন, কেবল চলতে ফিরতে পারেন না বলে একা-একা যেতে পারেন না ; তাছাড়া, আমি বলেছিলাম একদিন, আপনি যদি দিদির কাছ থেকে ফের কোনদিন টাকা আনতে যান তবে আমি ট্রামের তলায় মাথা দেব। বাবা আমাকে এখন ভয় করেন, অথচ বিশ্বাস করেন না আমায় একটুও ; অফিস থেকে ফিরতে যদি একটু দেরী হয়, তবেই হাজার প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে কোথায় গিয়েছিলে, ঠিকানা বল, বন্ধুর নাম কি, যেখানে গিয়েছিলে সেখানে ছেলে-ছোকরা ছিল কি না, থাকলে তাদের বয়েস কতো ইত্যাদি। এই ধর, সেদিন তোদের বাড়ীতে গিয়েছিলাম, দেখলি তো থাকতে পারলাম না ; বাড়ীতে এসে বাবার প্রশ্নের উত্তর দিতে যতো সময় লাগলো তোদের বাড়ীতে আমি ততো সময় ছিলাম না ; বাবা বোধহয় এখন তোর বাবাকে না দেখেও চেহারার ঠিক-ঠিক বর্ণনা দিয়ে যেতে পারেন। আমি আবার হঠাৎ কখন অজান্তে তোর দাদার কথা বলে ফেলেছিলাম, শুনে তো তিনি রেগেই খুন, তার পরে যখন বললাম সুদেষ্ণার দাদা অনেকদিন থেকে দিল্লীতেই থাকেন, মা মারা যাওয়ার পরে একবারও আসেন নি তখন যেন খানিকটা শান্ত

হলেন। কী বলবো ভাই আমার মরে যেতে ইচ্ছে হয় মাঝে মাঝে, কেবল পারিনে ছোট-ছোট ভাই-বোনগুলোর মুখ চেয়ে আর মা-র কথা ভেবে। না হলে বাবা আমাকে কী রকম অবিশ্বাস করেন শুনবি?

সুদেষ্ণা রেণুর মুখের দিকে না তাকিয়ে রেণুর একখানা হাত টেনে নিয়ে ওর ব্রোঞ্জের চুড়িটা নিয়ে থাকে আস্তে আস্তে। রেণু তখন মনের বন্ধ ঘরের দরজার শিকল খুলে ফেলেছে।—শুন্‌বি, কী রকম অবিশ্বাস করেন? বাবা বললেন, তোমার ঐ বন্ধুরা তো খুব বড় লোক, ওদের বাড়ীতে নিশ্চয়ই চাকর-বাকর আছে, তোমার ওদের বাড়ীতে অতো ঘন-ঘন যাওয়া ঠিক না। একথা শুনে মা আর থাকতে পারলেন না, কেঁদে উঠলেন।

বলতে বলতে রেণুর চোখ দিয়ে তীব্র অপমানের জল বেরিয়ে এলো। ব্যথারও।

তাইতে সুদেষ্ণার মনে হয় রেণু জন্ম থেকেই বিধবা। সেই রেণুর মনেও ভালোবাসার যুক্তিহীন আবেগ যে দেখা দিয়েছিল একবার, মাত্র একবারই সে খবর সুদেষ্ণার জানা। সেই ওই বিশ্ববখাটে অনিল ছোকরাটার জন্যে। অনিলকে চিনতো না সুদেষ্ণা পুরোপুরি, সাহেব পাড়ার ফিরিঙ্গি ছোকরাদের মতো করে ট্রাউজার-সার্ট পরে অফিসে আসতে দেখে ওর কেমন খারাপই লেগেছিল, তাতেও তার কিছু এসে যেতো না যদি না সুদেষ্ণার সঙ্গে গায়ে পড়ে ভাব জমাতে আসতো। ওর আসল রূপ শেখরই ওকে ধরিয়ে দিয়েছিল, যে শেখর কখনও কারও বিরুদ্ধে একটা কথাও বলে না। শেখর এমনিতেই সুন্দর করে, কথা বলতে পারে; সেদিন বলেছিল সুদেষ্ণার পাশের চেয়ারে বসে—মেয়েদের সম্বন্ধে আমার একটা সুস্থির ধারণা হচ্ছে।

—কী রকম? —মহাকৌতুকে সুদেষ্ণা প্রশ্ন করেছিল।

—মেয়েদের কোন জাত, কোন বর্ণ নেই; আসলে ওরা মেয়ে-জাত, রূপ কৌলীন্য থাকলেই হলো; মেয়েরা যেন গোলাপ ফুলের ডালি নিয়ে আছে, [illegible] সে ডালি দেখা না, তার গন্ধ-সৌরভ কেবল পুরুষদের আকর্ষণ করে। আর তাদের এই গন্ধ-সৌরভ আছে এটা মেয়েরা নিজেরা জানে বলে তাদের বয়স কখনও বাড়ে না।

সুদেষ্ণা হাসিতে ঝকমক করে উঠলো। ও দেখছিলো শেখরের কথা

বলার ধরণটা, কী বলছিল সে সেটা শোনার চেয়ে। সুদেষ্ণার ইচ্ছে হয়েছিল শেখরের ঠোঁট দুটো কামড়ে-কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়, যদি অফিসের ঘর না হয়ে কোন রেস্তোরাঁর পর্দা-ঢাকা প্রকোষ্ঠ হতো তাহলে হয়ত দু'হাত দিয়ে ওর ঠোঁট দুটো চেপে ধরতো।

—হাসলেন যে বড় !

—হাসবো না !

—আপনাকে আমি হাসতে বারণ করছিনে, হাসলে আপনাকে মানায় বটে। —শেখর ওর দিকে চোখ রেখেই বলেছিল।

—আর গম্ভীর হয়ে থাকলে আপনাকে আরও বেশি মানায়,—প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছি ·সুদেষ্ণা চেয়ারের পিঠের ওপর আরামে আধ-শোওয়া হয়ে, ওর বুক দুটো বেয়াড়া রকমের উন্নত হয়ে উঠেছে তখন ; সুদেষ্ণা দেখলো শেখর ওই দিকে চেয়ে আছে। কয়েক সেকেণ্ডে মাত্র। সুদেষ্ণা সোজা হয়ে বসলো। এটা অফিস না হয়ে ওর নিজের ঘর হলে বুকের ওপর টেনে নিত শেখরকে চেপে ধরতো প্রবল শক্তিতে, নিজেকে পীড়িত হতে দিতো শেখরের হাতে জাগিয়ে তুলতো শেখরের মধ্যে সেই শক্তি যা সব নারী চায় পুরুষের কাছ থেকে, বা সব পুরুষ দিতে চায় নারীকে। কিন্তু এটা অফিস।

—সে যাক ; মেয়েদের সম্বন্ধে হঠাৎ এই দার্শনিক সিদ্ধান্তের কারণ জানতে পারে কি ?

—বলাটা কি ঠিক হবে ? আপনাকে কতোটা বিশ্বাস করতে পারি সেটা বুঝতে পারছিনে !

—অবিশ্বাসের কারণ ?—সুদেষ্ণা সচকিত হয়।

—ঠিক অবিশ্বাস নয়, আপনার বুদ্ধির ওপরে আস্থা রাখতে ভরসা পাচ্ছিনে ব্যাপারটা বড় ডেলিকেট কিনা। শেষে কারোর দীর্ঘ নিশ্বাসের কারণ হয়ে দাঁড়াই এটা ঠিক চাইনে।

সুদেষ্ণা উৎসুক হয়ে ওঠে, কোন গোপন রহস্যের উন্মোচনের সীমানায় এসে পড়েছে বলে মনে হয় তার নিজেকে।

—আমার বুদ্ধির ওপর আপনি আস্থা রাখতে পারেন।—বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে সুদেষ্ণা বলেছিল, তখন শেখর অনিল সম্পর্কে গোটাকয়েক কথা বলেছিল, এবং বলেছিল, আপনার বন্ধু রেণুকে একটু চোখ-কান খোলা রেখে চলতে বলবেন।

সুদেষ্ণা রেণুকে পরের দিনই তার সন্দেহের কথা বলেছিল রেণু অনিলের সম্পর্ক সম্বন্ধে, আর জানিয়ে দিয়েছিল সাবধানের কথা। কিন্তু সুদেষ্ণা কিছুতেই অস্বীকার করতে পারে না, অনিলকে কেন্দ্র করেই হোক আর যে-কারণেই হোক, রেণুর জীবনের মরানদীতে হঠাৎ কোথা থেকে সফেন জোয়ার এসেছিল, সেই রকমই জীবন্ত হয়ে উঠেছিল সে। কিন্তু সুদেষ্ণা বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল, রেণু তার নিজের পক্ষে একটা কথাও
সুদেষ্ণা বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল, রেণু তার নিজের পক্ষে একটা কথাও
বলে নি, ধীর স্থির হয়ে শুনে গিয়েছিল সুদেষ্ণার কথা। প্রচণ্ড আঘাতে সাধারণত যে প্রাথমিক অসাড়তা আসে হয়ত তাই-ই আচ্ছন্ন করেছিল রেণুকে, কিংবা অনিলের সঙ্গে সাধারণ পরিচয়ের ভূমিকা পার হয়ে পরস্পরের জীবন জানাজানির অধ্যায়ে হয়ত রেণু পৌঁছায় নি। তাই ধাক্কাটা সামলে নিয়েছে মনে হলো। সুদেষ্ণা একটা সহানুভূতি বোধ করে, এ সহানুভূতি হয়ত অনাবশ্যক।

তারপরের দিন থেকে রেণুর মধ্যে আশ্চর্য এক পরিবর্তনের উন্মাদনা দেখতে পায় সে। খুব যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে রেণু, সকলের চোখে পড়ার মতো। শেখর সুদেষ্ণাকে রেণুর এই পরিবর্তন দেখে বলে গেল, ভালোবাসার অর্থ জানেন? জানেন না আপনি। আপনার বন্ধু মিস্ চ্যাটার্জি জানেন। ভালোবাসা মানে বেঁচে থাকতে মজা লাগা। মিস্ চ্যাটার্জি সেই বেঁচে থাকার মজা ক'দিনের জন্যে হলেও পেয়েছিলেন, তাই সেই স্মৃতি বিস্মৃত হওয়ার প্রায়শ্চিত্তের জন্যে এতো বে-হিসেবী হয়ে উঠেছেন। বন্ধুকে সামলাবেন।

সুদেষ্ণা হেসেছিল, মেয়েদের ব্যাপারে ছেলেরা চিরকালই ভুল করে এসেছে, এমন কি শেখরেরও ভুল হয়েছে। শেখর জানে না রেণুর বাড়ীর কথা। তাই সামলাবার কথা বলেছে। সুদেষ্ণা জানে—অনুমান করতে পারে রেণুর হঠাৎ এই উচ্ছলতার কারণ। প্রেমের অপমান হবে এটা সে সইতে পারবে না এটাও যেমন ঠিক, তেমনি অনিলের ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে দিতে পারে সংসারের মুখ চেয়ে, সে যার-পর-নাই খুশি হয়েছে।

পাঁচটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে কাগজপত্র, ফাইল ইত্যাদি গুছিয়ে নিয়ে উঠে পড়ে সুদেষ্ণা; চিঠিটার জবাব দেওয়া হলো, কী লেখা আছে পড়া হলো না। সেকসানের চারদিকে তাকিয়ে দেখে সে; দু'চারজন তার মতোই

উঠি-উঠি করছে, আবার অভয়বাবু, গোকুলবাবুরা হাত মুখ দিয়ে জল খেয়ে নিয়ে নতুন করে কাজে বসার উদ্যোগ করছেন ; এঁরা সব কখন যে বাড়ী ফিরবেন কে জানে ; পরের দিন সকালে এসে শুনবে, কেউ আটটায় বাড়ী ফিরেছেন, কেউ অফিস থেকে গেছেনই ন'টার সময়। এমনভাবে সব শোনাবেন সুদেষ্ণাদের যেন স্তালিনগ্রাদের লড়াইয়ে জিতে এসেছেন। আসলে বাড়ীতে ওদের মন টেঁকে না মনে হয়, স্ত্রীরা পুরোণো হয়ে গেছেই, পুত্রকন্যারাও যেন অনাবশ্যক বাড়তি হিসেবে গণ্য হয়।

শেখর তো ঐ রকম হয়ে যেতে পরে, চকিতে প্রশ্নটা উঁকি দেয় সুদেষ্ণার মনে। শেখর কেন, সুদেষ্ণা নিজেও তো কেমন এক ধরণের হয়ে যেতে পারে, সান্ত্বনার মতো হয়ে যেতে পারে। মনটা ভারী হয়ে ওঠে।

পায়ে পায়ে কখন সুদেষ্ণা তিনতলা থেকে নেমে এসেছে, এবং কেমন করে জানি য়ুনিয়ন অফিসের সামনে এসে পড়েছে। একবার ইতস্তত করে ভিতরে ঢুকে পড়ে সুদেষ্ণা। যদি আজ য়ুনিয়নের কোন মিটিং থাকে তাহলে অফিসে না এলেও শেখর মিটিংয়ে উপস্থিত থাকবে। এ রকম এর আগে দু'একবার হয়েছে। আজ শেখরকে তার বড্ড প্রয়োজন। তাকে চাই-ই।

—শুনুন!

একটা ছেলেকে ডাক্‌লো সুদেষ্ণা। ছেলেটি এগিয়ে এলো।

—আজ কি আপনাদের কোন মিটিং আছে য়ুনিয়নের?

—কেন বলুন তো?

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে ছেলেটি।

—চন্দ্রশেখরবাবু আজ আস্‌বেন?

সুদেষ্ণা শেখরের পুরো নামটাই উচ্চারণ করে, শুধু লোকলজ্জায় নয় ও যে নামে শেখরকে মনে মনে ডাকে সে নামটা নিয়ে কেউ ঠাট্টা করুক এটা সে সহ্য করতে পারবে না। রেণুকে ও প্রথম দিন প্রায় ধমকের সুরে বলেছিল, ওই নামটা ধরে তুই আমার সামনে রসিকতা করিসনে। রেণু শোনে নি, আমাকে তুই অন্যদের দলে ফেলিস্‌নে সু।

সুদেষ্ণা ওর সকাতর কথায় তার দ্বিতীয়বার আপত্তি জানতে পারে নি। রেণুকে ও আর আঘাত করতে চায় না। সেই থেকে রেণু কেবল বন্ধুদের মধ্যে চন্দ্রশেখরকে শেখর বলে।

—ওঃ, হাঁ, আজ মিটিং আছে, চন্দ্রশেখরবাবুর ত' থাকবারই কথা। তবে এখনও যখন এলেন না, তখন মনে হয় না আজ আস্তে পারেন।

ছেলেটি বললো।

সুদেষ্ণা নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো।

য়ুনিয়ন রুম থেকে বেরুতেই সুদেষ্ণা একেবারে সান্ত্বনার মুখোমুখি হয়ে পড়লো। সুদেষ্ণার হঠাৎ হেন ভালো লেগে গেল সান্ত্বনাদিকে। বিকেলের পড়ন্ত রোদের এক ফালি কোথায় কোন ফাঁক-ফোকর কিংবা স্কাইলাইট ভেদ করে সান্ত্বনার মুখে এসে পড়ে শুকনো গাল যেন ভরিয়ে দিয়েছে ; এ রোদে তাপ কম কিন্তু রঙ বেশি। সুদেষ্ণা কিছু বলার আগেই সান্ত্বনাই কথা বললো।

—তোমার আজ এতো দেরি যে !

—একটু কাজ ছিল, সান্ত্বনাদি।

এই বোধহয় সুদেষ্ণা সান্ত্বনাকে প্রথম দিদি বলে সম্বোধন করলো ; এর আগে অফিসের কোন কাজে ত বটেই, টিফিনের ঘরেও মিস মুখার্জী ছাড়া বলে নি। কিন্তু আজ তার ভালো লাগার দিন, আজ বোধহয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা সান্ত্বনার সঙ্গে গল্প করে কাটিয়ে দিতে পারে।

একটু ক্ষণের জন্য পড়ন্ত বেলায় শীতের সৌখীন রোদের রঙে সুদেষ্ণা যেন সান্ত্বনার জীবনের ব্যাখ্যা খুঁজে পেল।

—এখন কি বাড়ী যাবে, না, অন্য কোথাও ?

—না, এখ্খুনি বাড়ী যাবো না।

উত্তর দিতে সুদেষ্ণা একটু ইতস্তত করে, ঠিক কী যে সে করবে, কোথায় যে এখন যাবে তা সে নিজেই জানে না। তবে সে যে এখন সোজা বাড়ী যাবে না এটা ঠিক ; প্রথমত ইচ্ছেটা হলো গড়িমসি করে আরও কিছুক্ষণ শেখরের জন্যে অপেক্ষা করা অফিস-চত্বরে কিংবা বাস-ষ্টপের কাছে, ভিড়ে উঠতে পারছে না এই রকম একটা ভান করে।

—তুমি তো আবার গান-বাজনা করো শুনেছি। সেখানে যাবে বুঝি ?

সুদেষ্ণা সান্ত্বনার কণ্ঠস্বরের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়, কথা বলবার ধরণটাই কী সুন্দর সান্ত্বনাদির। উত্তরোত্তর ভালোই লাগছে সান্ত্বনাদিকে সুদেষ্ণার। আফিসের বিবর্ণ ফাইল আর নির্মম অফিস-অর্ডারের চাপে যে সান্ত্বনাদির কণ্ঠস্বর কাকের কোলাহলের সঙ্গে এক করে দেখতো সুদেষ্ণা তার সঙ্গে এই

সান্ত্বনাদির কণ্ঠস্বরের কত তফাৎ। শেখরকে মাঝে মাঝে সান্ত্বনাদির প্রশংসা করিতে শুনেছে, কতোবার স্বদেষ্ণা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ বিরক্তিই প্রকাশ করেছে তার জন্যে। কিন্তু আজ তার মনে হলো, শেখরের মন আছে, সুন্দর চোখ আছে তার, কাণ আছে।

—দাঁড়ালে কেন, চলো।

—হ্যাঁ, চলুন।

দু'জনে অফিসের চত্বর থেকে বাইরে এসে পড়ে। একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে স্বদেষ্ণা, বিকেলের পড়ন্ত রোদে সতরঞ্চির মতো দাগ-কাটা লাল রঙের বাড়ীটাকে যেন নররক্ত-লোলুপ রাক্ষসের মত মনে হয় ওর। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখে ঐ নররক্ত-লোলুপ রাক্ষসটার হাত থেকে আজকের দিনের মতো মুক্তি পেয়ে লোকগুলো রুদ্ধশ্বাসে দৌড়াচ্ছে। প্রাণের মায়ায় পালাচ্ছে। ওদের বর্তমান মুক্তকচ্ছ, ভবিষ্যৎ নিঃসন্দেহে হোঁচটেভরা।

—স্বদেষ্ণা, আজ কি চন্দ্রশেখর আসে নি?

প্রশ্নটা বেয়াড়া লাগে স্বদেষ্ণার, চন্দ্রশেখর অফিসে এসেছে কি আসে নি সে খবর অন্ততঃ তার কাছ থেকে জান্‌তে চাওয়া সান্ত্বনাদির উচিত হয় না।

—তোমার সঙ্গে ওর পরিচয় ঘনিষ্ঠ শুনেছি, তাই জিগ্যেস করলাম।

সান্ত্বনা যেন স্বদেষ্ণার মনের কথাটা ধরতে পেরে নিজের আগের প্রশ্নের কৈফিয়ৎ হিসাবে বলে। ওই কৈফিয়তে কোন কাণ না দিয়ে স্বদেষ্ণা সান্ত্বনার আগের আসল প্রশ্নটার উত্তর দেয়—না, সান্ত্বনাদি, আজ চন্দ্রশেখরবাবু আসেন নি; কেন, আপনার কি কোন প্রয়োজন ছিল?

—না, আমার কোন প্রয়োজন ছিল না ওর সঙ্গে। এমনি জিগ্যেস করলাম, ছেলেটিকে আমার খুব ভালো লাগে।

এর পরে দু'জনে চুপচাপ করে পাশাপাশি চলতে চলতে বাস ষ্টপে এসে দাঁড়ালো। সান্ত্বনার কথায় এমনি একটা স্নেহ ঝরে পড়লো যে অন্য কোন কথা বলে, কিংবা কেন শেখরকে তার ভালো লাগে জানবার ইচ্ছেটাও তার নষ্ট হয়ে গেল। সান্ত্বনাদির কথার, ব্যবহারের চমক তার বিস্ময়-বোধকেই বিস্মিত করেছে।

বাস-ষ্টপে এসে স্বদেষ্ণা এদিকে-ওদিকে তাকাতে থাকে।

—রমার বিয়ে হচ্ছে জানো?

হ্যাঁ, শুনেছি। কবে তা জানিনে।

—পরশু। যাচ্ছ নাকি তুমি ?

—যাওয়াটা ঠিক আমার ওপর নির্ভর করে না, কারণ যেতে বলবে কিনা জানিনে।

—ও। আচ্ছা, আমি ভাই চলি, আমার বাস এসে গেছে।

সুদেষ্ণা মাথা নেড়ে স্মিতহাস্যে বিদায় দিল সান্ত্বনাদিকে। কিন্তু সান্ত্বনাদিকে বিদায় দিয়ে সমস্যা বাড়ালো। ওর গন্তব্য পথের বাস তো এর আগেই খান-কয়েক চলে গেছে, কথা বলার অজুহাতে এতোক্ষণ সেগুলো ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়েছিল শেখরের জন্যে। এখন একা-একা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করাটা দৃষ্টিকটু। একবার ভাবলো হাঁটতে হাটতে এসপ্লানেডে চলে যায়, সেখানে গিয়ে ট্রামে। বেশ বেড়ানো হবে। আবার ভাবলে অতো হেঁটে কাজ নেই, একেবারে 'গীতি-তীর্থে' চলে যাওয়া যাক। দু'তিনদিন যাওয়া হয় নি ওদিকটায়, বিশাখাদি বকুনি দেবে, সামনে বার্ষিক সম্মেলন আস্‌ছে কতো হাঙ্গামা রয়েছে, চাঁদা আদায় রয়েছে, ডোনেসন বাগানো রয়েছে, অথচ সে পরপর ক'দিন অনুপস্থিত। বিশাখাদি একেবারে ক্ষেপে আছে নিশ্চয়ই।

বিশাখাদি যদি ক্ষেপে থাকে থাকুক, তাতে তার কী যায় আসে। সে তো গান শিখতে গেছে, সংঘ তৈরী করতে যায় নি। সংঘের সভ্য হিসাবে যতোটা করা দরকার ততোটাই করবে তার একক্রান্তি বেশি নয়। কিছুই নয়। বিশাখাদি রবীন্দ্রসংগীত গাইয়ে হিসেবে যে খ্যাতি পেয়েছে তার একশ' ভাগের এক ভাগও কি সুদেষ্ণা আগামী দশ বছর ধরে চেষ্টা করলে পাবে ? পাবেই না, কারণ চেষ্টাই করতে পারবে না। অতো ধৈর্য নেই সুদেষ্ণার দীর্ঘ দিনব্যাপী সাধনার কঠিন অধ্যবসায়ের দুস্তর সমুদ্র পেরুবার মতো মন-ই নেই তার। বিশাখাদি পারে, পেরেওছে; সংগীত যাদের ভালো লাগে, তা সে যে সংগীতই হোক, তারা প্রত্যেকে বিশাখাদির নাম জানে। সংগীতের ইতিহাসে বিশাখাদি অতি প্রোজ্জ্বল নাম। সুদেষ্ণা তার কাছে শিখ্‌তে গিয়েছিল, তার হয়ে সংঘ গড়ে দিতে যায় নি, মেয়ে জোগাড় করতে যায় নি সে সংঘের জন্যে, কারো জন্যে তো নয়ই। যতটুকু করেছে তা সত্ত্বেও সে তাই-ই যথেষ্ট, বিশাখাদি ও তামলবাবুর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করা উচিত। তা নয় কেবল চাপ দেওয়া; টাকা সে দেয় নিয়মিত, সংগ্রহ করেও দেয় নানা জায়গায় ফাংসান হলে কিছু রোজগারও হয় কিন্তু সে সব

কোথায় যায় কে জানে। বিশাখাদি মনে হয় দেখেও দেখে না' শুনেও শোনে না। কতো গার্জেন অভিযোগ করেছে বিশাখাদির কাছে' কিন্তু অতি সহজে জলের মতো খানিকটে যুক্তি আর খানিকটে মিষ্টি হাসি দিয়ে বিশাখাদি সে-সব উড়িয়ে দিয়েছে। তার আর কি, তার টাকার ভাবনা নেই তো, বড়লোক স্বামী আছে, টিম্বার মার্চেন্ট. টাকার অভাব তার হয় না। কিন্তু সংঘের টাকায় যে তমালবাবু অন্যায় থাবা বাড়ায় প্রতি মাসে প্রতি হপ্তায় তার কি হবে? অথচ এক-একটা সময়ে কি নিদারুণ ক্রাইসিস না গেছে গীতি-তীর্থের, সুদেষ্ণা আর কয়েকজন মিলে সে সব বিপদে কম করে নি। আর সেইটেই হয়ে গেছে যেন রেওয়াজ, যে হেতু ওরা ক'জন চাকরি করে, মাস গেলে মাইনে পায়, তাইতে যেন পেয়ে বসেছে বিশাখাদি, বিশেষ করে তমালবাবু। কিন্তু বিপদটা হলো সুদেষ্ণাদের অন্যদিক থেকে, একটা সংঘে ওরা ক'জন এসে জুটেছে। প্রায় গোড়ার দিকে। মায়া পড়ে গেছে হয়ত সংঘটার ওপর, তাছাড়া যায় কোথায়, অফিস আর বাড়ী, বড় জোর মাসে না হয় চারটে সিনেমা ; তারপর বাকি ছাব্বিশটে দিন মাসের কোথায় যায় তারা। অপর্ণা তো বলে, কোথায় যাই বল্। অফিস থেকে বাড়ী ফিরে ঘর-সংসারের কাজ দেখবো ঠিক করলাম, তা মা বলে, এই খেটে এলি বাপু, একটু বিশ্রাম নে। আচ্ছা. বল্ তো, দেহের বিশ্রাম তো রাত্তিরে ঘুমুলে হয়, মনের বিশ্রাম কি আর শুধু শুয়ে বসে থাকলে হয়?

—যা বলেছিস্, ভাই, সময় আর কাটতে চায় না!

গৌরী যোগ করে।

—কেন, তোরা একটু পড়াশুনা নিয়ে থাক্‌লে পারিস্, অন্তত আমার মতো এম. এ. টা পাশ করলে ত' পারিস্ বাড়ীতে বসে পড়ে পড়ে।

সুদেষ্ণা একদিন বলবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু অপর্ণা ও গৌরী আর দু' একজন একেবারে হৈ হৈ করে উঠেছিল।

—তাতে কি হতো শুনি, শিং বেরুতো, না ডানা গজাতো?

খেঁকিয়ে ওঠে গৌরী। কুন্তলার একটু বয়স বেশি ওদের চেয়ে, কথাও বলে কম এবং হিসেব করে। সে বল্‌লো, তুই এম. এ. পাশ করে কি আমাদের চেয়ে বেশি মাইনে পাস, না, তোর চাকরী আমাদের চেয়ে কোন অংশে ভালো। একই তো ব্যাপার। দুটো পাশ বেশি করলেই কি আর না করলেই বা কি। বিদ্যে তো দেখাতে হয় না অফিসে। কোন রকমে মাঝারী-গোছের ভুল

ইংরাজিতে চিঠি লিখ্তে পারলে হলো। এই ধর না আমার কথা, আমি গত পাঁচ মাসে বোধ হয় নিজের নাম সই করা ছাড়া দু'লাইনও ইংরেজি লিখেছি কিনা সন্দেহ।

কুন্তলার কথাই ঠিক। আসলে, মীরা বলে, ছেলেদের তবু চলে ফিরে বেড়ানোর সুযোগ আছে, জায়গা আছে, স্বাধীনতা আছে। আমাদের সে সব কিছুই নেই। তার ওপর আমাদের অবস্থাটা হয়েছে এমন, যদি, ধর, আমি ক্রিকেট নিয়েই আলোচনা করি, তাহলে লোকে শুন্লে হাস্বে, আর তোরা হয়ত আমার সঙ্গে মেশাই ছেড়ে দিবি।

এক নিঃশ্বাসে বলে মীরা। মীরার কথায় সবাই সায় দেয়। আর সেইজন্য এই গীতি-তীর্থের পেছনে সকলের এতোখানি আন্তরিক স্বার্থ ত্যাগ। এখানে অন্ততঃ সকলে এসে মিলে দু'টো মনের কথা বলা যায়, গান-বাজনার নাম করে এসে। কিন্তু তমালবাবুর জন্যে বোধ হয় সে পাঠ এবারে চুকিয়ে দিতে হয়। ভারী দায় পড়েছে ওর।

নাঃ, যাবে না সে গীতি-তীর্থে আজ' সুদেষ্ণা ঠিক করে ফেলে। বিরক্ত হয়ে উঠেছে সে। আরও বিরক্ত হয়েছে শেখরের ওপর, মাঝে মাঝে এমন বেমক্কা ডুব মারে যে সারা কলকাতা চুঁড়ে বেড়ালেও তাকে টেনে তোলা যাবে না। কেন' পলিটিক্স কি আর কেউ করে না' না কি একা শেখরই করে। আবার বাক্চাতুরী আছে; বলে কি, লাভ্লেস্ পিপ্ল আর পুয়োর পেট্রিয়টস। ইস্, ওর নিজের যেন কতো সেদিকে হুঁস আছে। সুদেষ্ণা বিরক্তিতে জোরে জোরে পা ফেলে চলে।

পায়ে পায়ে কখন যে সুদেষ্ণা বাথগেটের দোকান পর্যন্ত চলে এসেছে, খেয়ালই নেই।

শীতকাল। দিন শেষ হতে-না-হতে দেখ্তে দেখ্তে রাত নামে, যেন হঠাৎ ঝুপ করে অন্ধকার আকাশ থেকে নেমে পড়ে রাত্তিরটা হুমড়ি খেয়ে, কেউ ভালো করে সন্ধ্যেটা উপভোগ করার আগে। চারিদিকে কুয়াশা নামে; ঠিক কুয়াশা নয়, ধোঁয়া আর কুয়াশা মিলে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয় বলে মনে হয়। তখন দূরে দূরে বিন্যস্ত লাইট পোষ্টের আলোগুলো অদ্ভুত লাগে; কোন অশরীরী মায়ালোক সৃষ্টি করে। ডালহৌসীর জনবিরল রাস্তায় তখন বেড়াতে বেড়াতে মনটাকে ফাঁকা লাগে। বড্ড একা-একা বোধ হয় নিজেকে।

এ অভিজ্ঞতা সুদেষ্ণার এই প্রথম। তাই একবার সামনে আর একবার পেছনে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে নিতে থাকে সে। কেমন গা ছম্ ছম্ করা সন্ধ্যে।

—মিস রায় যে! কোথা থেকে?

সুদেষ্ণা একটু চম্‌কে যায়, চেয়ে দেখে সামনেই দেবনারায়ণবাবু। বাথগেটের নিচে দাঁড়িয়ে; হাতে কিসের যেন একটা মোড়ক।

দেবনারায়ণবাবুকে কেমন নতুন মানুষ লাগে, এ যেন সেই জুল-জুল করে চেয়ে থাকা রামগরুড়ের ছানা নয়, এ যেন সেই প্যাঁচালো ইংরেজিতে ড্রাফ্‌ট কারেক্ট করা অ্যাকাউন্ট্যান্ট দেবনারায়ণবাবু নয়। এ এক অন্য মানুষ, মুখে আশ্চর্য মিষ্টি হাসি।

সুদেষ্ণা সাম্‌নাসামনি দাঁড়ালো।

কী, চুপ করে রইলেন যে?

দেবনারায়ণবাবু হাসি মুখেই প্রশ্ন করেন। অথচ ঐ ক'টি কথা অফিসের যে কোন লোক কাজে ভুল করলে তিনি কী বিশ্রী ভাবেই না উচ্চারণ করেন।

—অফিস থেকেই ত' আসছি।

—তা তো জানি, তা হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে কেন?

—এমনি চলে এলাম, এস্‌প্লানেডে যাবো একটু কাজ রয়েছে। ওখান থেকে ফিরবো পরে। আপনি কোথা থেকে?

সুদেষ্ণা নিজের মিথ্যে কথাটাকে চাপা দেওয়ার জন্যে দেবনারায়ণবাবুকে প্রশ্নটা করে বসলো।

—এই তো বাথগেট-এ ওষুধ কিন্‌তে এসেছিলাম, তিনটে ওষুধ কিনতে দেখুন কতো দেরী হয়ে গেল।

—শুনেছিলাম বটে. আপনার স্ত্রীর অসুখ। তা এখন কেমন আছেন?

—ভালো না বিশেষ। এই দেখুন না, তিনটে ওষুধে বিয়াল্লিশ টাকা লেগে গেল।

—অনেক দিন থেকে ভুগ্‌ছেন বুঝি?

—নাঃ, তেমন বেশি দিন খুব নয়; তবে গত চব্বিশ বছরের মধ্যে একদিনও যার সর্দিজ্বর হয় নি, সে যদি আজ একটু ভোগায় তাহলে দোষ দিই কেমন করে?

কথাগুলো বল্‌তে বল্‌তে দেবনারায়ণবাবুর গলা যেন একটু ভারী হয়ে

উঠলো। সুদেষ্ণা যেন লজ্জায় পড়ে গেল। এমন বেয়াড়া প্রশ্ন তার করা ঠিক হয় নি। সুদেষ্ণারই বা দোষ কি। আফিসে ঢুকে ইস্তক দেখ্‌ছে বয়েস যাদের পঞ্চাশের একটু এধারে-ওধারে তারা সকলেই প্রায় বাড়ীর কথা বল্‌লে এমন একটা ভাব দেখায় যে বাড়ীর সঙ্গে কেবল খাওয়া ও শোয়ার সম্পর্ক। হরিদাসবাবু, রাখালবাবু, গোকুলবাবু এঁরা সবাই পাঁচটার পরে কাজ আরম্ভ করেন। বাড়ীটা যেন এঁদের কাছে ব্রিটিশ আমলের আন্দামান, বাড়ীর নাম করলে এঁরা শিউরে উঠা ছাড়া আর বাকি সব করেন। এই তো সেদিন অভয়বাবুকে সুদেষ্ণা রহস্য করে বলেছিল, আপনি এমন মজার লোক, বৌদি কেমন লোক দেখ্‌তে ইচ্ছে করে, নিয়ে যাবেন একদিন ?

—নিয়ে যেতে পারি, তাতে আপত্তি কি। তবে এইটে জেনে রাখো, আমার দেশলাই আর কেরোসিন কিন্‌তে হয় না, কেবল ঘুঁটে কিনলেই কাজ চলে যায়।

অভয়বাবু মনে হয় বেশ গম্ভীর হয়েই বলেছিলেন।

—তার মানে ?

সুদেষ্ণা অভয়বাবুর কথা বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থেকে জিগ্‌গেস করেছিল অভয়বাবুকে।

—তার মানে, অফিস থেকে বাড়ী গিয়ে তোমার বৌদির মুখের কাছে খান-কয়েক ঘুঁটে ধরি, অমনি ধরে যায় আগুন, ঘুঁটে ধরে গেলে উনুনে ফেলে কয়লা চাপা দিই। এই চল্‌ছে দু'বেলা রোজ।

সুদেষ্ণা হাসি চাপতে পারে নি, খিল্ খিল্ করে হেসে উঠেছিল সে, সঙ্গে সেকসনের আরও অনেকে।

—চলুন মিস রায়, আপনাকে এসপ্লানেড পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আমি ট্রামে উঠে পড়বো ওখান থেকে।

সুদেষ্ণা ও দেবনারায়ণ পাশাপাশি চলতে থাকে।

—মিস রায় !

সুদেষ্ণা মুখের দিকে তাকালো দেবনারায়ণবাবুর।

—তেমন কোন তাড়া আছে এখন ?

—না তেমন কিছু না। কেন?

—তাহলে, চলুন, আর একটু হাঁটি, চৌরঙ্গীর লোকজন দেখ্‌তে দেখতে।

—তা চলুন।

—মিস রায়, একটা কথা বল্‌বো?

—বলুন না।

—কোথাও বসে এক কাপ চা খেয়ে নিই চলুন। আপত্তি আছে?

—না, আপত্তি কিসের। এম্‌নিতে চা খাওয়ার সময়টা মারা গেছে।

আরও খানিকদূর নিঃশব্দে দু'জনে এগিয়ে চল্‌লো। পাশাপাশি। দেবনারায়ণবাবুর বলিষ্ঠ দেহের স্পর্শটা যেন ওর কাছে উষ্ণ-উষ্ণ লাগে।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সুদেষ্ণা হয়ত; অন্যমনস্ক হয়েই রাস্তা পার হচ্ছিল; হা-হা করে ওঠে দেবনারায়ণবাবু, করো কি, করো কি, দেখে রাস্তা পার হবে ত, বল্‌তে বল্‌তে সুদেষ্ণার ডান হাতখানা দেবনারায়ণবাবু বাঁ হাত দিয়ে এতো জোরে আকর্ষণ করলেন যে সুদেষ্ণা আর টাল সামলাতে না পেরে দেবনারায়ণবাবুর গায়ের ওপর গিয়ে পড়লো। জড়িয়ে ধরলো তাঁকে দু'হাত দিয়ে, লেপটে গেল ওর গায়ের সঙ্গে।

কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। একটু থেমে সোজা হয়ে আবার চলতে আরম্ভ করল সুদেষ্ণা।

—কোথায় বসবেন?

সুদেষ্ণা প্রশ্ন করে।

—চলুন যে-কোন একটা জায়গায়।

—না, যে-কোন জায়গায় বসবো না। সবায়ের দৃষ্টির সামনে চুক্ চুক্ করে চা খেতে বা হাউ হাউ করে গিল্‌তে আমার ভাল লাগে না।

সুদেঁষ্ণা জোরের সঙ্গে বলে।

দেবনারায়ণ একটু হাসলেন।

—তাহলে পিপিং?

—বেশ আপত্তি নেই, তবে দূরও যেমন, দামও বেশি।

একটা মৃদু প্রতিবাদ দেবনারায়ণের মুখে শোনা যায়। সুদেষ্ণা হাসলো।

—আচ্ছা এতে হাসির কি আছে?

—প্রথমত দূরত্বের কথা ওঠা উচিত নয় এই জন্যে, খানিকটে হাঁট্‌বো বলেই ত' আমরা ড্যালহৌসী থেকেই ঠিক করেছি; দ্বিতীয়ত, দামটা আমি

একা দিতে পারি তবে দু,জনে মিলে দিলে কোন আপত্তির কারণ থাকে না।

সুদেষ্ণার অকাট্য যুক্তি। যুক্তিটার শেষ অংশটা সম্পর্কে সুদেষ্ণার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা অর্থাৎ দামটা সে-ই দেবে কারণ শেখরকে এখানে ডেকে আনবে এই ছিল তার অফিসে বেরুবার সময় থেকেই পরিকল্পনা। শেখর যদি সুযোগ না গ্রহণ করে তবে দোষ সুদেষ্ণার নয় বা যে শেখরের পরিবর্তে গ্রহণ করবে তারও নয়।

পাশাপাশি চল্‌তে চল্‌তে সুদেষ্ণার মনটা নানা-রকম চিন্তার আবর্তে ঘুরপাক খায়। শেখরের সঙ্গে এ রকম বহু জায়গায় বহু রেস্তোরায় সে এসেছে। রাস্তা চল্‌তে তখন অনেক মেয়ে-পুরুষ ওদের দিকে তাকিয়ে দেখেছে। হয়ত ঈর্ষার দৃষ্টিতে তাকিয়েছে; শেখরের চাবুকের মতো চেহারার দিকে তাকিয়েছে, সুদেষ্ণার দিকেও তাকিয়েছে। কিন্তু আজ যেন কেউ তাদের দিকে তাকিয়ে দেখছে না। দেবনারায়ণের সঙ্গে রাস্তায় চলার এই একটা সুবিধে কোনও কৌতূহল, কোন তির্যক-দৃষ্টি তাদের বিদ্ধ করে না। জনতার মধ্যেও কতো নির্জন লাগছে। খুসি হয় সে। শেখরের সঙ্গে একদিন এই রকম গিয়েছিল পিপিং-এ এইভাবে পাশাপাশি হেঁটে। ও অবশ্য চেয়েছিল রিক্সায় করে যেতে। ট্যাক্সি না, ট্রাম-বাস্ না, রিক্সায়। রিক্সায় করে দু'জনে যেতে ওর খুব ভালো লাগে, গা ঘেঁসে-ঘেঁসে বসে এঁটে সেঁটে, বেশ লাগে। সবটুকু উত্তাপ যেন গায়ে টেনে নেওয়া যায় নিঃশব্দে, রোমাঞ্চিত হওয়া যায় মনে মনে।

কিন্তু রিক্সায় চড়তে শেখরের ঘোর আপত্তি—মানুষ-টানা গাড়ীতে বসে যেতে আমার ভালো লাগে না, বড্ড নিষ্ঠুর মনে হয় নিজেকে।

এর উত্তর খুব কড়া যুক্তি দিয়েই দেওয়া চলে। সুদেষ্ণার মনে যুক্তিগুলো তীক্ষ্ণ হয়ে সারিবদ্ধ হয়ে জমা হলেও শেখরের মুখের দিকে তাকালেই কেমন সব তালগোল পাকিয়ে পিণ্ডের আকার ধারণ করে।

সে দিন এই রকম পাশাপাশি চল্‌ছিল শেখরের সঙ্গে। বোধহয় দেখেছিল রমা, রমা দাশগুপ্ত। পরের দিন অফিসে গিয়ে কান-পাতা দায়। কী ব্যাপার, না সুদেষ্ণা প্রকাশ্য চৌরঙ্গীর রাস্তা দিয়ে নিয়নের আলোয় চন্দ্রশেখরের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে যাচ্ছিল। গিয়েও যদি থাকে তাতে কার কী। সে কথা ঢাক পিটিয়ে বলার দরকার কি। লেখাপড়া জানা

একটা মেয়ে রমা। কিন্তু সব শিক্ষা-দীক্ষা ওর মিথ্যে হয়ে গেছে। রুচির এমন বিকৃতি দেখা যায় না। সুদেষ্ণা কেবল হাত ধরা-ধরি করে গেছে কোন ছেলের সঙ্গে? তোমরা যাও না? সব পাখীতেই মাছ খায়, বক তো মাছ খাওয়ার একজন, কিন্তু দোষ হয়েছে মাছরাঙ্গার! কিন্তু সুদেষ্ণা নিচে নামতে পারে নি।

না হলে রমা সম্বন্ধে সে-ও তো কিছু গোপন কথা, আর তা নোংরাও বটে, ফাঁস করে দিতে পার্‌তো সকলের কাছে। কিন্তু তাতে তার নিজের রুচিই বিকৃত বলে মনে হতো।

একদিন একটা জরুরী ফাইল নিয়ে ছোটসাহেবের ঘরে যাওয়ার দরকার হলো তার। ছোটসাহেব নিজেই তাড়া দিয়েছেন কয়েকবার। দিল্লী থেকে প্রধানমন্ত্রীর না অন্য কোন মন্ত্রীর সেক্রেটারী ট্রাঙ্ককল করে ছিলেন বেলা তিনটের মধ্যে দু'দুবার।

সেই ফালইটা রেডি করে নিয়ে ছোটসাহেবের ঘরে ঢুকতে যাবে, বেয়ারা পথ আটকালো। তখনকার মতো ফিরে এলো সে এই দেবনারায়ণবাবুই তো পাঁচ মিনিটের মধ্যে আবার যেতে বল্‌লেন তাকে।

সুদেষ্ণা ছোটসাহেবের ঘরের সামনে এলো আবার, দেখলো বেয়ারাটা নেই, ভাবলো তাহলে নিশ্চয়ই ছোটসাহেব ফ্রী আছেন।

সুইং ডোর-টা ঠেলে ভেতরে ঢুকে সে লজ্জায় পড়ে গেল।

ভূত দেখার মতো আঁতকে উঠে সে বেরিয়ে এলো।

রমা ছোটসাহেবের টেবিলের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে আর বিগতযৌবন ছোটসাহেব রমার কোলে মাথা গুঁজে রয়েছে।

বেচারা রামলগনের আর ঐ আফিসে বসে খৈনী টেপার সুযোগ আসে নি। আর আফিসের ফাইল হারানোর জন্যে রমাকে যে চার্জশীট দেওয়া হয়েছিল তা উইথড্রন হয়েছে।

সুদেষ্ণা কি এ কথা কাউকে বলেছে? না, অত নীচ সে নয়। বরং রমার সঙ্গে তার কথাবার্তা সে আগের চেয়ে একটু বাড়িয়ে দিয়েছিল।

আজ দেবনারায়ণের সাথে যেতে যেতে এই কথাগুলো তার মনে এলো।

হঠাৎ আরও একটা ভাবনায় সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

মনে হলো, দেবনারায়ণের সঙ্গে সঙ্গে যেতে যেতে। মাথায় ঘোমটা দিয়ে গেলে কেমন লাগে। দেবনারায়ণের সঙ্গে। নিদেন স্কার্ফটা যদি টেনে ঘোমটার মতো করে দেয়।

শেখরের সঙ্গে যেতে গিয়ে কখনও তার এ রকম মনে হয় নি, তার পাশাপাশি যেতে ঘোমটা দেওয়ার কথা সে ভাবতেই পারে না।

শেখরের প্রিয়া হতে ভালো লাগে, আর—আর দেবনারায়ণের বৌ।

কথাটা মনে মনে বলে ফেলে সুদেষ্ণা দেবনারায়ণের মুখের দিকে তাকালো--কি যেন ভাবছে লোকটা।

সুদেষ্ণা স্কার্ফটা মাথায় ঘোমটার মতো করে টেনে দিলো।

দেবনারায়ণ এক নজর তাকিয়ে দেখলেন, একটু যেন মুচকি হাসলেন। উনিও কি এ রকম কিছু ভাবছেন!

—শীতটা বেশ পড়েছে। আকাশ থেকে যেন ঝুপ্ ঝুপ্ করে দলা-দলা শীতের ঠাণ্ডা পড়ছে, না?

দেবনারায়ণ বলেন। ওঁর মনেও কাব্যের ছোঁয়া লেগেছে যেন।

ছোট্ট একটা 'হুঁ' করে কথার জবাব দেয় সুদেষ্ণা।

—শুনছেন?

সুদেষ্ণা কথা বলার চেষ্টা করে।

—কী?

সুদেষ্ণা কিছু বলতে যাওয়ার আগে দেবনারায়ণ ডান হাতখানা নিজের মুখে দিয়ে 'শ্' শব্দ করেন আর বাঁ হাতখানা সুদেষ্ণার বুকের সাম্‌নে আড়াআড়ি বাড়িয়ে দিয়ে ওর গতিরোধ কর্‌তে চেষ্টা করেন।

সুদেষ্ণা চলার বেগ হঠাৎ বন্ধ করতে না পারায় দেবনারায়ণের বাঁ হাত গিয়ে লাগে সুদেষ্ণার দুই বুকের ওপর। একটা চাপ লাগে বুকে একটা শিহরণ ছড়িয়ে যায় সারা দেহে সুদেষ্ণার। ঠিক এই রকম একটা চাপ তার বুকে লেগেছিল অনেকদিন আগে, এই রকম একটা শিহরণে সে মাতাল হয়ে গিয়েছিল আর একদিন। সেদিন অশোক ওর বুকে মুখ গুঁজে কান্নাকাটি কর্‌ছিল গীতার জন্যে, ভেঙে পড়েছিল অশোক সেদিন। বন্ধু ভেবে সুদেষ্ণার কাছ থেকে সহানুভূতি চেয়ে কান্নাকাটি কর্‌ছিল। সেইদিন অশোকের মাথাটা বারবার তার বুকে লেগে কেমন একটা মাদকতাময় শিহরণের সৃষ্টি

করেছিল, অশোককে পাবে না জেনেও সে সেদিন অশোককে ঠেলে দেয় নি। দূরে সরিয়ে দেয়নি নিজের দেহের কাছ থেকে। এবং অশোকের সুন্দর চুল ভর্তি মাথাটা জোর করে বুকের সঙ্গে ধরে রেখেছিল।

মাত্র কয়েক মুহূর্ত। সুদেষ্ণা সম্বিৎ ফিরে পায়।

—কী হলো?

চকিত প্রশ্ন করে সে।

দেবনারায়ণ সাম্‌নের দিকে ইসারা করেন চোখ দিয়ে, মুখে তখনও তাঁর ডান হাতটা। আর বাঁ হাতটা সুদেষ্ণার সামনে বাড়ানো।

সুদেষ্ণা সামনের দিকে তাকিয়েও কিছু দেখতে পায় না, কিন্তু বিস্মিত হয় দেবনারায়ণের কাণ্ড দেখে, ওর বুকের নরম স্পর্শ কি দেবনারায়ণকে এতোটুকু সচেতন করে নি। শেখর হলে হাত নামিয়ে নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতো, হয়ত লজ্জা-লজ্জা দুষ্টুমির হাসিতে বিভোর হয়ে থাকতো। অশোক যেমন মাথা সরিয়ে নেয় নি, দেবনারায়ণও তেমনি হাত নামিয়ে নেয় নি। দেবনারায়ন কি অশোকের মতো!

—কী হলো, চলুন।

সুদেষ্ণা অধৈর্যের তাড়া লাগায়।

—আঃ, ঐ দেখ।

দেবনারায়ণ সাম্‌নের অভিজাত পাড়ার অভিজাত পানের দোকানটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন।

—দেখ্‌ছো না মিসেস চৌধুরী!

দেবনারায়ণ উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে বলেন।

—তাতে কী হয়েছে?

—কী হয়েছে! আমার কি হবে, হলে তোমারই হবে।

—আমার আবার কি হবে?

—বেশ, আমার কি হবে!

দেবনারায়ণ যেন হতাশ হয়ে পড়েন।

—আমার সঙ্গে এমন সন্ধ্যে-বেলা অমন ঘোমটা দিয়ে গেলে কালই অফিসে টি-টি পড়ে যাবে। তাতে আমার কিছু হবে না, হবে তোমার বিপদ ত মেয়েছেলেদের!

সুদেষ্ণা হাসলো।

ওর হাস্‌বার দুটো কারণ ছিল, দেবনারায়ণের বলার ভঙ্গিটাই হাসির প্রথম কারণ, দ্বিতীয় সুদেষ্ণার জন্যে দেবনারায়ণের উৎকণ্ঠা দেখে। আরও একটা কারণ ছিল। দেবনারায়ণ হঠাৎ কখন থেকে 'মিস রায়' বলা, কিংবা 'আপনি' সম্বোধন ছেড়ে একেবারে 'তুমি বলতে সুরু করেছেন।

—কথায় কথায় মেয়েরা যে কি হাসে আমি বুঝিনে। অতো হাসি আসে কোথা থেকে তোমাদের? আশ্চর্য।

—হাসবো না? তোমার রকম দেখেই ত' হাসছি।

দেবনারায়ণকে হঠাৎ 'তুমি' সম্বোধন করে বসলো সুদেষ্ণা। দেবনারায়ণও চকিত হলো।

—তাছাড়া, আমি স্মৃতিদিকে ভয় করিনে।

স্মৃতিকে তুমি ভয় করো না?

—কেন, কিসের ভয়।

—তোমার বন্ধু চন্দ্রশেখরের সঙ্গে স্মৃতির কি খাতির তুমি জানো? ওরা প্রায় কাছাকাছি পাড়ায় থাকে তা জানো? একই সঙ্গে অফিসে আসে তা জানো? কথায় কথায় তোমার-আমার সম্পর্কের কথাটা বলে ফেলা আশ্চর্য কি খুব? সব দিক না ভেবে তোমরা মেয়েরা কথা বলো, কাজ করো! চলো একটু ফুটপাত ঘেঁসে দাঁড়াই।

সুদেষ্ণাকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে দেবনারায়ণ ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে ফুটপাথের প্রান্তে ময়দানের দিকে মুখ করে দাঁড়ালো।

স্মৃতি চলে গেল ওদের পেছন দিয়ে।

সুদেষ্ণা দাঁড়িয়ে রইল।

—মেয়েদের সম্বন্ধে তোমার ধারণা খুব সুন্দর দেখ্‌ছি।

—সুন্দর কি না জানিনে, তবে তোমাদের সম্বন্ধে এই আমার অভিজ্ঞতা।

—মেয়েরা বোকা তা আমি স্বীকার করিনে, কিন্তু ভগবান তো তাদের পুরুষের সঙ্গে সমান মনে করেই সৃষ্টি করেছেন।

দেবনারায়ণ হাসলো।

—দেখ আমরা মেয়েরা জানি, ছেলেরা ভালো খাবার পেলে খুসি হয়, ভালো বাড়ী পেলে খুসি হয়, কিন্তু কোন ভালো মেয়েকে তাদের ভালো লাগে না।

সুদেষ্ণা কথাটা বলেই দেবনারায়ণের মুখের দিকে তাকালো।

অতো সুন্দর কথাটা ওর নিজের নয়, নিজের অভিজ্ঞতার আলোতে পাওয়া নয়, ও-কথা শেখরই একদিন বলেছিল। কথাটা বলে দেবনারায়ণের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্যে একদৃষ্টে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

—ভালো মেয়ে ?

দেবনারায়ণ বুঝ্‌তে পারে না।

—ভালো মেয়ে মানে ভালো মেয়ে। ভালো দেখতে মেয়ে নয়, যে পুরুষের সঙ্গে হৈ হৈ করে বেড়ায় না, বিয়ে হলে স্বামীর সঙ্গেই ঘর করে, এমন মেয়ে।

—কথাটা ঠিক। তবে কথাটা আমাকে শোনানো কেন ?

দেবনারায়ণ কেমন অস্বস্তি বোধ করে যেন, সুদেষ্ণা বুঝতে পারে।

রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে পড়ে দেবনারায়ণ। নিজেকে তার কেমন ছেলেমানুষ লাগে দীর্ঘ-দিনের বিবাহিত জীবনের শেষে এসে এক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে যেন।

দেবনারায়ণকে রেলিং ধরে দাঁড়াতে দেখে কথাগুলো সুদেষ্ণার মনে হলো। ওর মুখ-চোখ যেন কেমন পাংশুল হয়ে উঠেছে বলে সুদেষ্ণার মনে হয়। সুদেষ্ণার চোখ ও মুখের আহ্বানে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিতে গিয়ে দেবনারায়ণ যেন নাজেহাল হয়ে পড়েছে, ওকে দেখ্‌লে ভাঙা বেহালার মতো মনে হয়। কিংবা দেবনারায়ণের জীবনটাই যেন ভাঙা বেহালা আর দেবনারায়ণ যেন এক বেহালা-বাদক, সভার মাঝে বাজাতে এসে হঠাৎ এ কি দুর্দৈব।

এই রকম একটা ভাব হয়েছে দেবনারায়ণের মুখে।

এর একটা কারণও ভেবে দেখ্‌লো সুদেষ্ণা। এই শীত-সন্ধ্যায় ওর চোখে ও মুখের দুর্বোধ্য স-কাম আহ্বানে সাড়া দিতে গিয়েই যে কেবল দেবনারায়ণ এই রকম একটা বিপর্যয় নিজের ওপর নিয়ে এসেছে তা নয় এই রকমটি ঘটবে যে তার জন্যে প্রস্তুত ছিল না দেবনারায়ণ। আকাশে ধীরে ধীরে কালবৈশাখীর মেঘ জমে' ধুলো-বালি ওড়ে, বিদ্যুতের দিগন্ত-প্রবাহী আলো জলে ওঠে, তারপরে নামে ইন্দ্রের বজ্র। কিন্তু ফাঁকা আকাশ থেকে এখন এক বজ্রপাত তার জীবনে। এই বজ্রপাতে ধিকি-ধিকি জলুনি আছে. একমুহূর্তে জলে শেষ হয়ে যায় না, এ জলে আর জালায়। এই

কারণে আত্মসংযমের অহঙ্কারী আবেষ্টনী থেকে বেরিয়ে এসে দেবনারায়ণ ছট্‌ফট্ করতে সুরু করেছে। সুদেষ্ণা বুঝতে পারে।

সুদেষ্ণা আর একটু দেখতে চায়, করপোরেশনের অফিসার যেমন করে দুধে জলের পরিমাণ ল্যাক্টোমিটার দিয়ে মেপে দেখে।

অশোককে চার অক্ষরের যে কথাটি বলতে পারে নি বলে প্রথম যৌবনের ক'টা বছর ফাঁকা বুক নিয়ে কাটিয়েছে, শেখরকে অতিরিক্ত সঙ্গদান করে সর্বদা হারাই-হারাই ভাবনায় সশঙ্ক-জীবন কাটিয়েছে, দেবনারায়ণের ওপর দিয়ে তার সুদ শুদ্ধ আদায় করে নিলে কেমন হয়। ভাবে সুদেষ্ণা।

—রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি?

সুদেষ্ণা আর একটু গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে। দেবনারায়ণের বাঁ হাতখানা সুদেষ্ণার বুক ছুঁয়ে কোমরের নিচে গিয়ে লাগে। আর একটু সরে দাঁড়ায় সুদেষ্ণা।

দেবনারায়ণ সরে যায় না।

—কটা বাজলো দেখোতো।

দেবনারায়ণ জিগ্যেস করে।

হাত ঘড়িটা দেখে নিয়ে সুদেষ্ণা বলে,

—প্রায় আটটা। কেন?

—আজ থাক, রাত হয়ে গেল বেশ।

দেবনারায়ণের গলায় যেন ভেঙে পড়ার সুর।

সুদেষ্ণা বুঝলো দেবনারায়ণ সময় চায় অভ্যস্ত সংস্কারের লাইনে চলে এতকাল এখন যে-লাইন হওয়ার শক্তি সঞ্চয় করে নিতে চায়। বাপে বিয়ে দিয়েছিল কলেজ ডিঙোবে না ডিঙোতে সেই কোন বালককালে কুড়ি বছর বয়েসে, তারপরে দীর্ঘ চব্বিশ বছর বৌ ছাড়া অন্য কোন মেয়েদের দিকে তাকাতে পারে নি, কথা বলা দূরে থাক। এখন হঠাৎ সুদেষ্ণা চেপে ধরতে চাইলেই কি চাপ সইবে। দেবনারায়ণ সময় চায়।

সময় দিতে হবে বৈ কি।

—বেশ থাক।

বলে একটুক্ষণ থামলো সুদেষ্ণা।

—আমার কথায় কি বাবুর রাগ হলো না কি?

—কোন কথায় ?

—এরই মধ্যে ভুলে গেছো নাকি !

ভোলে নি দেবনারায়ণ। হেসে বলে,

—না, না ভুলবো কেন? অতো সুন্দর কথা অতো সহজে ভোলা যায় !

—তাহলে কাল আসছো তো এখানে ?

দেবনারায়ণ মাথা নাড়ে।

—সাড়ে পাঁচটায় কিন্তু।

আবার মাথা নাড়ে দেবনারায়ণ।

কুয়াশার মধ্যে দ্রুত মিলিয়ে গেল দেবনারায়ণ। পালিয়ে গেল যেন।

ওর চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থেকে খানিকক্ষণ সুদেষ্ণা ট্রাম ধরবার জন্যে এগুলো।

দেবনারায়ণ মাথায় বাড়ি-খাওয়া জন্তুর মতো পালিয়ে গেল।

ট্রামে উঠে জানালার ধারের সিটটা দখল করে বসতেই যে কথাটা প্রথম সুদেষ্ণার মনে হলো। না কি সত্যি ও কাল সাড়ে পাঁচটায় আসবে।

হাঁফিয়ে ওঠে সে। ট্রাম চলেছে। জানলা দিয়ে হু-হু করে ঠাণ্ডার ছিটে আসছে। বেশ লাগে ওর। এতোক্ষণ মনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে, উন্মুখ আবেগের সামনে সংযমের কংক্রীট বাঁধ বাঁধতে হয়েছে অতি আয়াসে।

ক্লান্তি আসে।

কিন্তু ভালো লাগে। এই হৃদয় নিয়ে খেলা করতে করতে সুদেষ্ণা যেন একটা পাকা খেলোয়াড় হয়ে উঠেছে। অথচ এ ত' একটা অ্যাকসিডেণ্ট। সে কি ছোটবেলায় ভেবেছিল যে, এইভাবে তাকে অপরের মন ভোলানোর জন্যে দু'হাতে যৌবনের ডালি নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে। ভাবে নি সে। অন্য অনেক মেয়ে ছোটো বয়েসে রান্নাবাড়ি খেলেছে, শিবপূজোর দিনে শিবের পূজো বেশ মনোসংযোগ করেই করেছে, শিবরাত্রিতে রাত্তির জেগেছে। অপর্ণা, মীরা, কুন্তলা, গৌরী প্রভৃতি সেই ধরণের সমাজে পরিবেশে মানুষ হয়েছে, কিন্তু তাদেরও যে অবস্থা

সুদেষ্ণারও সেই অবস্থা। ওদের শিবপূজোর দোষ ত্রুটি থাকতে পারে, তাই হয়ত যৌবন মরা মাছের চোখের মতো বিবর্ণ ফাইলগুলো ঘেঁটে ঘেঁটে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তার কী না ছিল।

আজ যখন যৌবনের জোয়ারে ভাঁটার টান লাগতে সুরু করেছে তখন কিনা বাবা বলছেন, তোমার মতামতের প্রশ্ন আছে বিয়ের ব্যাপারে। তা-ও কথাটা স্পষ্ট করে বলতে পারলেন না। অথচ দাদার বিয়ে না দিলে নয়, তার নাকি বড্ড অসুবিধে হচ্ছে। না-কি দাদা বিদেশে বিদেশে ঘুরতে ঘুরতে বিয়ের বয়েসটা কাটিয়ে দিলে বাবার বংশ রক্ষে হবে না, সেই ভয়ে কি দাদার বিয়ের জন্যে চেষ্টা করেছেন। আর বিয়ে করবে না জানিয়ে দিয়েছে দিদি, তাতেই ওঁর কর্তব্য ফুরিয়ে গেছে, আর সে নিজে জানায় নি, ঘৃণাক্ষরেও বুঝতে দেয় নি ওর মনের গতি কোন পথে তাই কি-না একটু বুড়ি-ছোঁয়া মতো করে বললেন, তোমার মতামতের প্রশ্ন আছে।

বাবার ওপর মায়া-মমতা সহানুভূতিতে সকালবেলা ওর মনটা ভরে ছিল, বাবাকে ও যেন এই প্রথম ভালোবাসতে সুরু করেছিল; কিন্তু এখন মনটা বিরক্তিতে ভরে ওঠে। রাগ হয়ে যায় ওর।

ট্রামে উঠবার সময়ে বাড়ী ফিরবে ভেবেছিল সুদেষ্ণা, কিন্তু চিন্তার ধারা তার খানিকপরেই তাকে অন্যদিকে টেনে নিয়ে গেল। না সে আজ অন্যদিনের চেয়েও দেরী করে ফিরবে। জানে, বাবা তার জন্যে বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করবেন অসুস্থ শরীর নিয়ে, তারপরে পিসিমাকে ডাকবেন, বলবেন, দেখলি ত' মণ্টুটা বিকেল-বিকেল আসবে বলে রাত ন'টা বাজিয়ে দিল।

পিসিমা-ও বলবেন, ছোটোবেলায় সময় থাকতে রাশ টেনে ধরোনি, এখন ধিঙ্গি-মেয়েদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারবে?

বাবা তখন ফোঁস করে অসহায়ের দীর্ঘনিশ্বাস ফেলবেন।

তারপরে হয়ত বলবেন, আমি কী করবো বল, মনোরমা আমাকে কিছুই বলতো না, ছেলে-মেয়েদের বিয়ের উদ্যোগ কি আমায় করতে হবে।

বাবার এই যুক্তিতে পিসিমা বিরক্ত হবেন, দেখ দাদা, বৌদির দোষ দিও না। বৌদি ছিল বলে তোমার ছেলেমেয়েরা আমার ছেলেমেয়ের মতো হয় নি। আমি দেখতাম না বলে আমার এইদুর্দশা।

এই বলে পিসিমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

ভাইবোনের কথা এই ভাবে শেষ হবে। এই রকম ভাবে শেষ হয়ে এসেছে যখন থেকে পিসিমা ওদের বাড়িতে এসে উঠেছেন।

সুদেষ্ণা দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছে পিসিমার দীর্ঘনিশ্বাসে বাবা একটু নার্ভাস হয়ে পড়বেন। ধীরে ধীরে উঠে যাবেন শোয়ার ঘরে। পিসিমা খানিকক্ষণ বসে থেকে দুলালের মাকে জেগে থাকতে বলে নিজেও শুতে যাবেন। আর সে গিয়ে পঞ্চাশবার কড়া নেড়ে ভুতুড়ে বাড়িটার ঘুম ভাঙাবে।

পিসিমার জন্যে দুঃখ হয় সুদেষ্ণার। মা-র ঠিক উল্টো পিসিমা, যেমন বাবা ঠিক উল্টো পিসেমশায়ের। পিসেমশায়ে ব্রজআঁটুনি দিয়েছেন, আর পিসিমা প্রাণপণ চেষ্টা করে সেই আঁটুনি ফস্‌কা গেরোয় পরিণত করতে চেষ্টা করেছেন। পিসেমশায়ের সঙ্গে রেষারেষি করেছেন তিনি, তা নয়। আসলে পিসিমা ভারী ঢিলে-ঢালা মানুষ, ভাইবোনে সেদিক থেকে মিল চোখে পড়ার মতো। পিসিমার বুকে শেল বিঁধে আছে মেয়ে রিণির জন্যে।

রিণিকে পিসিমা আদর দিয়ে মাথায় তুলেছিলেন, পিসেমশায় আপ্রাণ চেষ্টা করেও নিজের বশে আনতে পারেন নি তাকে। লেখাপড়ায় মেয়েটার মাথা ছিল বেশ, কিন্তু পড়াশুনা করবে না এইটেই যেন ঠিক করেছিল। স্কুলে পড়বার সময়েই রাজ্যের বখাটে ছোক্‌রাগুলোকে নিজেদের ড্রয়িংরুমে এনে চা খাওয়াত আর হাসি-ঠাট্টা করতো। পিসেমশায় তখন কোর্টে বেরিয়ে গেছেন পিসিমা এসব দেখতেন, কিন্তু কিছু বলতেন না, বরং ছেলেগুলোর মাসিমা ডাক শুনেই তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। নিজের ছেলে তখন বিলেতে, ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে গেছে।

পিসিমার প্রশ্রয় পেয়ে রিণি একেবারে স্বর্গ হাতে গেল। যাকে বলে বেলেল্লাপনার চূড়ান্ত করে ছাড়ল।

ফল হাতে হাতে ফললো।

পিসেমশায় মাথায় হাত দিয়ে বসলেন।

কিছুদিন ঝামেলায় কাটলো।

তারপরে পিসেমশায় ঠিক করলেন, পাড়ার এই বখাটে ছেলেগুলোকে ঠাণ্ডা করে দেবেন আইনের সাহায্যে, পুলিশের সাহায্যে। অনেকটা এগিয়ে ছিলেন তিনি। রিণিকে কড়া নজরেও রেখেছিলেন তিনি। কিন্তু একদিন

কোর্টে বেরুচ্ছেন, রাস্তার মোড়ে—বাড়ি থেকে এই খানিকটে দূরে—একদল ছেলে তাঁকে ঘিরে ধরলে, যাদের অনেকেই তিনি চেনেন, যাদের অনেকের বিরুদ্ধে তিনি পুলিশের কাছে রিপোর্ট করেছিলেন। তারাই ঘিরে ধরলো তাঁকে।

—কী চাই তোমাদের ?

—কিস-স্থ, চাইনে মশায়, শুধু জেনে রাখবেন পাড়ায় থাকতে হলে পাড়ার লোকের সঙ্গে মিশতে হবে। বুঝলেন, সম্‌ঝে চলবেন।

মনের রাগ মনেই চেপে পিসেমশায় চলে গেলেন।

আস্তে আস্তে তাঁর ব্লাডপ্রেসারটা বেড়ে গেল।

এর পরে একদিন রিণি পিসিমাকে ধরলো, মা আমি চাকরী করবো।

—সে কি, তুই চাকরি করবি কি ? তুই চাকরীর কি বুঝিস ?

—চাকরীর আবার বোঝাবুঝির কী আছে ; যেমন সব মেয়ে করে আমিও তেমনি করবো, তবে আই-এ পাশ করলাম কেন ?

রিণি উত্তর দেয়।

পিসিমা ভাবলেন, চাকরী-বাকরী করলে হয়ত পাঁচজনেরা সঙ্গে মিলে মিশে মেয়ের মতিগতি ভালো হবে। তাই রিণি পিসিমশায়কে গিয়ে ধরলো।

পিসেমশায় কিছুতেই রাজি হলেন না প্রথমটায়, আমার কি টাকার অভাব যে মেয়ে চাকরী করবে আর আমি বসে বসে খাবো ? পড়ুক না ও যদ্দূর খুশি। তা নয়, যতো সব !

শেষে পিসিমার জেদাজেদিতে পিসেমশায় রাজি হলেন।

রিণি চাকরী করতে গেল।

পিসেমশায় জানতেন, একটা কিছু ঘটবেই।

ঘটলো-ও।

তিন মাস যেতে-না-যেতে একদিন রিণি অরুণ না কি নাম ছেলেটার, তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে পিসেমশায়কে প্রণাম করে বললো, বাবা আশীর্বাদ করুন, আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে।

পিসেমশায় ত' থ।

সম্বিৎ ফিরলে, পিসেমশায় বললেন, দেখো অরুণ, তোমার বোধ হয় মনে নেই, তোমার বাবা আমার মক্কেল ছিলেন, আমি তোমার প্রথম বিয়েতে গিয়েছিলাম, তোমার সে বউ কি মারা গেছে।

রিণি তো আকাশ থেকে পড়লো, অরুণ তো পালাবার পথ পায় না। কী কাণ্ড!

রিণি সেই যে বাড়ি থেকে সেদিন সন্ধ্যাবেলা চলে গেল আর আসে নি, এমন কি পিসেমশায়ের মারা যাওয়ার দিনেও না।

শোনা যায় এখন চার-পাঁচটি মেয়ে ওরা একটা বাড়ি ভাড়া করে মেসের মতো করে থাকে। রিণির দাদা বিলেত থেকে ফিরে বিয়ে করেছে, ছেলে মেয়ে হয়েছে; বাড়িতে আর যায়গা কোথায় রিণির।

পিসেমশায়ের প্রতি দুঃখ আর বাবার অতি বিরক্তি নিয়ে সুদেষ্ণা ট্রাম থেকে নাম্‌লো।

গীতি-তীর্থের পথে পা বাড়ালো সুদেষ্ণা।

রাত সাড়ে আটটার পরে সে ফার্ণ রোডের মোড়ে, রাত ক'টায় সে সাহাপুর কলোনীতে যাবে কে জানে।

স্খলিতপদে চলে সুদেষ্ণা।

এবার উলটো ভাবনায় পেয়ে বসে তাকে।

জীবনটা কি খেলার জিনিষ, হেলাফেলার জিনিষ, সুখ-শান্তি সম্পদ খোঁজার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় কি শেষ হওয়ার জিনিষ।

ভালোবাসার শেষ কি বিয়েতে।

আচ্ছা একটি ছেলে একটি মেয়ে যারা পরস্পরকে ভালোবাসে বলে শুনি তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কি কথা বলে পরস্পর-পরস্পরের কানে-কানে! এই যে সব জোড়ায়-জোড়ায় ছেলেমেয়েরা ঘুরে বেড়ায়, এরা কী মিষ্টি বাজে কথা ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস বলে। ওর এক বন্ধু মায়া দীর্ঘ ছ'বছর একটি ছেলের সঙ্গে প্রেমে পড়ে হাবু-ডুবু খাচ্ছে, শীগগির ওদের বিয়ে হবে; সেই ছেলেটি আর মায়া দু'জনে অফিসের পর গত ছ'বছর একই নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে দেখা সাক্ষাৎ করে গল্প করে, চা খায় আর হয়ত-বা এদিকে ওদিকে তাকিয়ে চুমুও খায়।

দীর্ঘ ছ'বছরেও তাদের ক্লান্তি নেই।

আর সুদেষ্ণা ছ'বছরের মধ্যে অশোককে ভালোবাসার কথা বলতে পারলো না, তিন বছরেও শেখরকে শোনাতে পারলো না তার হৃদয়ের কথা। অথচ একজনকে সে ভালোবেসেছিল, আর একজনকে সে ফিরিয়ে দিতে

পারবে না, আর যাকে সে ভালোবাসে না বা এখনও সেই অবস্থার পৌঁছায় নি সেই দেবনারায়ণকে তার অতি সহজে' তুমি' সম্বোধন পর্যন্ত করতে খুব বেশি সময় লাগে নি। অথচ দেবনারায়ণকে—

—এই সুদেষ্ণাদি!

সুদেষ্ণা মুখ তুলে দেখলো মীরা।

—কী মেয়ে বাপু তুমি। কোন পাত্তা নেই ক'দিন! আমরা তো ভেবে মরি! আজই তো তোমার বাড়ি যাবো ভেবেছিলাম, কিন্তু যাওয়া হলো না!

মীরা তড়বড় করে কথা বলে হাঁপাতে থাকে। তড়বড় করে কথা বলা ওর স্বভাব। ও সাধারণ যে-কোন মেয়ের তুলনায় বেশ বেঁটে, কিন্তু মোটা নয়, ও তড়বড় করে কথা বলে আর খরখর করে চলে; তাই ওর অফিসের পুরুষ কেরানীরা ওর নাম দিয়েছি বেবি ট্যাক্সি। এই নামই ওর কাল হলো, বরং ওর ওই দুটো স্বভাবই ওকে একেবারে পথে বসিয়েছে। ওর আফিসের একটা ছেলের সঙ্গে ওর বেশ-ভাব-সাব হয়েছিল, হয়ত কিছুদিনের মধ্যে বিয়ে হতো—। ছেলেটি ভালো, বেশ রুচিবোধ আছে, সাহিত্য টাহিত্য করে। তার কানের কাছে অন্য কেরানীরা মীরাকে যখন বেবি ট্যাক্সি বলতো তখন ওর মনটা বিরূপ হয়ে উঠতো, কিছু বলতে পারতো না বেচারা, তাহলে তার প্রেম একেবারে হাটের জিনিষ হয়ে যাবে! শেষকালে বেচারা আর থাকতে পারলো না, মীরাকে ডেকে বললো—দেখ, তোমাকে বিয়ে করতে গেলে আমাকে চাকরী ছাড়তে হবে।

—কেন

মীরা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিল।

—কেন, শুনবে?

—হ্যাঁ।

খুব কষ্ট পাবে কিন্তু।

—তা পাই, পাবো।

—দেখ, অফিসে সকলে তোমাকে বেবি-ট্যাক্সি বলে; তোমাকে বিয়ে করলে আমাকেও রেহাই দেবে না, তখন ওরা তোমাকে বেবি-ট্যাক্সি

বলবেই, আর আমাকে বেবি-ট্যাক্সীর ড্রাইভার বলবে। সেটা শুনতে পারা ও শুনে সহ্য করার মতো মানসিক শক্তি আমার নেই।

শুনে মীরা কেঁদে বাঁচে না

কতো বুঝিয়েছে মীরা, চাকরী ছেড়ে দিয়ে দু'জনে মাষ্টারী করবে বলেছিল, তাতেও কিছু হলো না। শেষে গৌরী ও কুন্তলা পর্যন্ত গিয়ে ছেলেটিকে কতো বোঝালো। কিছুতেই কিছু হলো না।

কিন্তু খবর কিছুই গোপন রইল না।

কেমন করে অফিসের লোকে মীরার ব্যাপার জেনে গিয়েছিল, আগে তারা শুধু বেবি-ট্যাক্সি বলতো মীরাকে, এবার থেকে বলতে আরম্ভ করলো, বেবি-ট্যাক্সি ড্রাইভারের দোষে অ্যাকসিডেণ্ট করেছে।

বেচারা কেঁদে মরে!

—কেন খাওয়া হলো না জানো?

দম নিয়ে মীরা বলে।

—কেন রে?

—এদিকে এক কাণ্ড ঘটেছে; গীতি-তীর্থ এবারে উঠে যাবে; না যায় তো কী বলেছি!

—কী হয়েছে তা-ই বল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবল হাত-পা নাড়ছিস কেন?

এ কথায় মীরা একেবারে মিইয়ে যায়।

—গিয়েই তখন শুনবে।

বিরস-মুখে বলে মীরা।

—কেন, তুই বলতে পারবি নে?

—বলতে পারবো না কেন। তুমি কি আমার কথা শুনবে? আমি তো কেবল হাত-পা নাড়ি!

সুদেষ্ণা হেসে ফেলে। মীরার চিবুক ধরে বলে,

—হয়েছে রে, হয়েছে, অতো রাগ কিসের! তোর কাছ থেকে শুনে নিই, এখানে দাঁড়িয়ে, তারপর বুঝে শুনে যাবো, নইলে এখান থেকেই বাড়ি ফিরবো। রাত তো কম হচ্ছে না!

—সে কি! এদ্দুর এসে ওখানে না গিয়েই ফিরে যাবে!

—না, তা কেন। আগে তোর কাছ থেকে শুনি ব্যাপারখানা কি, তারপর ঠিক করবো—ফিরবো কি গীতি-তীর্থে এই রাত্তিরে যাবো।

মীরা তবু চুপ করে থাকে।

—চুপ করে রইলি যে!

—না, বাপু, আমি বলতে পারবো না, কী বলতে কী বলে ফেলবো শেষকালে সকলে আমার দোষ দেবে; আমি এ সবে নেই। আমার ভালো লাগে না।

সুদক্ষা বিরক্ত হয়।

—তবে তুই এতোক্ষণ ধরে ভূমিকা করলি কেন?

ঐ দেখ তুমি চট্‌তে আরম্ভ করেছে; চট্‌লে কেউ শুনতে পারে কোন কথা! তুমি বলতে বলছো আমায়! কিন্তু সে এক নাটক, অতোশতো বলতে পারিনে বাপু গুছিয়ে।

মীরার গলা ধরে আসে। মেয়েটার মনটা ভারী নরম। এমন মেয়েকেও কেউ দুঃখ দেয়! মীরার প্রেমিক সেই ছেলেটির ওপর সুদেষ্ণার রাগ হয়। অপদার্থ একটা!

—থাম, ছিঁচকাঁদুনে কোথাকার! বল, শুনি কী হয়েছে।

সুদেষ্ণা ধমক দেওয়ার ভাণ করে।

অগত্যা মীরাকে বলতে হয় কী ঘটেছে।

বন্ধ-হয়ে-আসা স্টেশনারী দোকানটার সামনে দাঁড়ায় দু'জনে।

—কুন্তলাদি আজ অফিসে যায় নি কী জানি কেন; তাই সকাল-সকাল গিয়েছে ওখানে। তখন প্রাথমিক বিভাগের ছেলেমেয়েরা এসেছে। কুন্তলাদি গিয়ে শুনলো, বিশাখাদি এসেছে, তমালবাবুও এসেছেন। লোকটাকে আমি একেবারে দেখতে পারিনে।

ধমক দেয় সুদেষ্ণা সত্যি-সত্যি।

—বলছি তো? তুমি তো জানো, বিশাখাদির চেম্বারে কেউ না বলে যেতে পারবে না। এখন এক ভদ্রমহিলা এসে বললেন, এখানে শরতবাবু বলে কেউ থাকেন?

কুন্তলাদি ভাবলে হয়ত কেউ থাকতে পারেন, আমাদের ত' অনেক

ছেলে মেম্বার আছে, তাদের কারো হয়ত নাম হবে, শরৎ। কুন্তলাদি ভদ্র-মহিলাকে বসতে বলে বিশাখাদিকে জিগ্গেস করতে ওর চেম্বারে ঢুকেই হতভম্ব।

—কেন ?

উচ্চকিত হয়ে ওঠে সুদেষ্ণা।

—সে আমি বলতে পারবো না বাপু সবটা। মোট কথা কুন্তলাদির ঢোকটা ঠিক হয় নি, অবশ্য কুন্তলাদি কী করে জানবে, বলো ? যাহোক, কুন্তলাদি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো। আসতেই ভদ্রমহিলা আবার জিগ্গেস করলেন, আছেন নাকি কেউ ওই নামে ?

কুন্তলাদি কিছু বলবার আগে তমালবাবু একেবারে বাজখাঁই গলায় কুন্তলাদিকে ডাকলেন। ইতস্তত করে কুন্তলাদি ভেতরে যেতেই সে কি অশ্লীল-ভাষায় গালাগালি। কুন্তলাদি একেবারে কেঁদে ফেলেছে তখন। মরিয়া হয়ে কুন্তলাদি বলে ফেলেছে, আপনি যে বিশাখাদির সঙ্গে ঐ রকম অবস্থায় তা কী করে জানবো ?

কথাগুলো কুন্তলাদি শেষ করেছে কি করে নি, ভদ্রমহিলাও গুটিগুটি গিয়ে পড়লেন সেখানে।

ব্যস, তমালবাবু ভদ্রমহিলাকে দেখে একেবারে চুপসে গেলো, একেবারে কেঁচোটি।

ভদ্রমহিলার কী কথার বাঁধুনি ! তমালবাবুকে কী বলাটাই না বললো।

—সংক্ষেপে বল কী বললো।

সুদেষ্ণা ধৈর্য হারিয়ে ফেলে।

—বললো, ব্লাফ্ দিয়ে বৌ থাকতেও আমায় বিয়ে করেছিলে ; সেটাকে এখন পাকিস্তানে পাড়ার লোকের ভরসায় রেখে এসেছো। আবার, এখানে এসে আর একটা মেয়ের সর্বনাশ করছো। এই মেয়েটা দেখেছে বলে, তার ওপর তম্বি করা হচ্ছে ! যাক, তোমার যা খুশি তা করো, আমার কিছু বলার নেই। মেয়েরা তো আজকাল আর মেয়ে নয়, সব স্টেশনারী গুড্স হয়ে গেছে কি-না তাই মজা লুঠতে পারছো। বেশ। সে যাক, আমার খোরপোষের টাকাটা কি দেবে—পাঁচ মাস তুমি দাও নি, ঠিকানা লুকিয়ে বেড়াচ্ছো। সন্ধান পেয়ে এখানেই এলাম আজ। তা দেখছি, নাম বদলেছে। বেশ। এখন বলো কোর্টে যাবো আবার, নাকি ?

—তারপর ?

সুদেষ্ণা জিগ্‌গেস করে।

—তারপর আর কি! বিশাখাদি চেম্বার থেকে বেরিয়ে এলো। এসে ভদ্রমহিলাকে চেম্বারে নিয়ে গেল, তমালবাবুও সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। তমালবাবুর নাম যে শরৎ বিশাখাদি তা জানতো, কারণ অনেক গাইয়েরা ত' নাম বদলায়, তাই শরৎচন্দ্র তমাল-তরুণ হলে আপত্তি করতে পারে নি। যাহোক, কিছু টাকাপয়সা নিয়ে তবেই ভদ্রমহিলা গেছেন। ভদ্রমহিলা চলে যাওয়ার পর থেকে ঘোঁট চলতে থাকে। একে একে আমরা সবাই এসে পড়ি। আমরা কুন্তলাদিকে সাপোর্ট করি। এখন তুমি কী বলো তার ওপর আমাদের সব নির্ভর করছে, গীতি-তীর্থে থাকবো, না যাবো চলে আমরা সবাই। আমি আর থাকছি নে বাপু।

সুদেষ্ণা একমিনিট ভেবে নেয়।

এইভাবে গীতি-তীর্থ বাঁচিয়ে রাখা যাবে না, এরপরে হয়ত বদনামের ভাগ ওদেরও হতে হবে।

—চল্, ফিরি।

সুদেষ্ণা বলে।

—সে কি! তুমি ওখানে যাবে না ?

—না, কাল একবার আসবো।

সুদেষ্ণা বেশ গম্ভীর গলায় বলে। ট্রাম ধরবে বলে এগোয়।

—এই সুদেষ্ণাদি !

—কী, বল্।

—এদিকে আর এক কাণ্ড হয়েছে।

ফিস্ ফিস্ করে বলে মীরা।

—আবার কি কাণ্ড হলো ?

দাঁড়ায় সুদেষ্ণা।

—কাউকে বলবে না বল।

—কাকে আবার কি বলতে যাচ্ছি ?

—না তাই বলছি। বিশাখাদি আবার তোমার বন্ধু কি না তাইতে বলবো কি না ভাবছি।

—না ভেবে বল তুই। এতোক্ষণ কি ভেবে ভেবে বলেছিল ?

—না তা বলি নি অবিশ্যি।

—তবে?

—তবে বলে ফেলি। গৌরীদি বলতে বারণ করেছিল যদিও।

সুদেষ্ণা আর চাপতে পারে না

—তুমি হাসছো আর আমার বলে কান্না পাচ্ছে!

ধরা-গলায় বলে মীরা।

মেয়েটা কি সত্যিই কাঁদতে আরম্ভ করবে না কি এই রাত দশটার সময়ে। কেলেঙ্কারীর একশেষ হবে আর কি তাহলে।

—তোর কান্না পাওয়ার কারণ?

—বিশাখাদির জন্যে?

—গৌরীদি বলছিল, বিশাখাদির স্বামী নাকি বিশাখাদির ওপর খুব চটে গেছে। ওদের সম্পর্ক নাকি সব চুকে-বুকে গেছে। আজ থেকে গীতি-তীর্থেই বিশাখাদি নাকি থাকবে। কী হবে সুদেষ্ণাদি?

—কী আবার হবে?

দার্শনিক উদাসীনতা নিয়ে সুদেষ্ণা উত্তর দেয়।

—যার যা হয় হোক, তোর কি? যা, বাড়ি গিয়ে খেয়ে-দেয়ে ঘুমোগে।

সুদেষ্ণা মীরার মন থেকে অনাবশ্যক দুঃখের কারণগুলো সরিয়ে দেওয়ার জন্যে বেশ জোর দিয়েই বলে।

সুদেষ্ণা আবার ট্রাম ধরবার জন্যে এগোয়।

—সুদেষ্ণাদি, একটি কথা বলবো?

—কী, বল।

ফিরে দাঁড়ায় সুদেষ্ণা।

মীরা এগিয়ে যায়।

গভীর স্বরে গোপন কথা বলার মতো করে বলে,

—আচ্ছা, সুদেষ্ণাদি, জীবনটা কি খেলার জিনিষ, না খোলাম কুচি!

নিঃশব্দে হাঁটতে-হাঁটতে এসে দু'জনে বাসে ওঠে। সুদেষ্ণা ও মীরা। একটা সিটে পাশাপাশি বসে দু'জনে।

মীরার চোখে তন্দ্রা, হাই চাপার চেষ্টা করে। সুদেষ্ণার মায়া হয় ওকে দেখে। হাজার হলেও বেচারার বয়স তো কম, নার্ভের এতো ধকল সারাদিন ধরে সহ্য করতে পারবে কেন। সুদেষ্ণার কথা আলাদা। অনেক পোড় খেয়েছে। অনেক অভিজ্ঞতায় পোক্ত। মীরার মতো ভিজে ন্যাকড়া নয় সুদেষ্ণার মন।

তবু সুদেষ্ণা গীতি-তীর্থে উঠে যাবে বলে দুঃখিত হয়। শেখর ঠিকই বলেছিল পুরুষের সাহায্য ছাড়া মেয়েরা নিজের কোন কাজ করতে পারে না, একটা সংঘ, একটা অনুষ্ঠান পুরোপুরি মেয়েদের দিয়ে হয় না। ওরা তিনদিনে সব তিন-নয়-ছয় করে দেব।

মীরা মাঝখানে নামবে।

সিট ছেড়ে মীরা চীৎকার করে ওঠে—

এই সুদেষ্ণাদি, খুব ভুল হয়ে গেছে। তোমার খোঁজে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন তখন ওখানে।

—কে রে? কি নাম?

—দূর কি যে হয়েছে আমার! এসেছিলো চন্দ্রশেখরদা ন'টা নাগাদ তোমার বাসায় যাবেন বলেছিলেন, যদি সময় করে উঠতে পারেন তবেই। খুব নাকি জরুরী কথা ছিল তাঁর। আমার অনেক আগেই বলা উচিত ছিল তোমাকে!

মীরা নেমে গেল।

আর কি বলতে যাচ্ছিল, শেষ করতে পারলো না। বাস ছেড়ে দিল!

সুদেষ্ণা হাতঘড়িতে দেখলো, দশটা বাজে।

মনে মনে একবার হিসেব করে নিল, যদি শেখর একঘণ্টা বসে থাকে তাহলে এখনও তাকে পাওয়া যেতে পারে। ও যখন বলেছে সুদেষ্ণার বাড়ীতে যাবে, তখন যাবেই ঠিক, এ বিষয়ে কেনো সন্দেহ নেই। পিসিমা অপেক্ষাও করতে বলবেন, সেটাও ঠিক। কিন্তু কতোক্ষণ অপেক্ষা করবে সে সেইটাই কথা। কাজের ত' ওর অন্ত নেই। কিন্তু কাজ মাথায় করে কি এতো রাতে আসবে, মনে হয় না!

বাস থেকে নেমে পড়ল স্থদেষ্ণা তাড়াতাড়ি।
একটা ট্যাক্সি নিল।

সরু গলিটার মুখে ট্যাক্সি থেকে নামল স্থদেষ্ণা।

নিথর-নীরব রাত শীতে ভারী হয়ে আছে যেন বাতাসের ওপর। অদ্ভুত রহস্য চারিদিক ঘিরে রেখেছে, ইট-কাঠ, ঘর-বাড়ীগুলো, এদিক-ওদিকের দু'চারটে ছোট-বড় গাছ যেন সেই রহস্যের আবেষ্টনীতে ভারী রাতের নিচে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। অন্ধকার কোণ ঘুপচিগুলোয় যেন সজীব হয়ে উঠে আকাশের দু'চারটে মিটি-মিটি তারার সঙ্গে ভাব জমাতে চাইছে। শীতের স্বাদু গন্ধ যেন ঘিরে ধরেছে আষ্টেপৃষ্ঠে অ্যাসফ্যাল্টের নতুন মসৃণ রাস্তাটাকে। একটুকরো বিবর্ণ চাঁদের ফালি থেকে ঐ গন্ধ যেন ঝরে পড়ছে।

রাত্রিটাকে দেখে নি সে কখনও এর আগে এমন করে। সকালটাকে কখনও এর আগে দেখে নি সে, ছোটবেলা থেকেই দেখতে অভ্যস্ত নয় বলেই। আর কেরাণী-মেয়ের চোখে বিবর্ণ ফাইলের রং এতো বেশী লেগে থাকে যে বিকেলের রঙ চোখে ধরে না। আর রাত্রি কেবল তার বুভুক্ষু দেহের তটে আছাড় খেয়ে পড়েছে, তাই রাত্রিটাকেও সে এমন করে চেনে নি কখনও।

খুশির টোপর মাথায় দিয়ে ফেরে সে। সারাদিনের ক্লান্তি আর সারাদিনের তৃষ্ণা যেন বিস্রস্ত পোষাক থেকে ঝরে পড়ে গেছে কোথাও।

অন্ধকারে ঘুমন্ত বাড়ীটার সামনে এসে দাঁড়ালো সে। রবীন্দ্রনাথের একটা গানের কলি গুন্‌গুনিয়ে ওঠে ওর গলায়—

মুখ পানে চেয়ে দেখি, ভয় হয় মনে
ফিরেছো কি ফেরো নাই বুঝিব কেমনে।

ওর বসবার ঘরে তখনও আলো জ্বলছে।

শুধু নরম হাতে কড়া নাড়ল স্থদেষ্ণা।

চোখ দুটো ঘুমে ভারী হয়ে আসে। জোর করে চেয়ে থাকবার চেষ্টা করেও পারে না। এমন আঠার মতো পাতাগুলো জুড়ে যেতে চায়। কলমটা ধরে হয়ত খানিকক্ষণ বসেই থাকে ; কয়েক মুহূর্ত পরে হয়ত চোখ দুটোকে জোর করে বিস্ফারিত তাকিয়ে দেখে। যেখানকার কলম সেইখানটায় রয়ে গেছে। একটা শব্দও তার লেখা হয় নি। চন্দ্রশেখর ফাইলপত্তর সরিয়ে রাখে বিছানার পাশে। লেখা আর এগুবে না একটুও। কাঁহাতক আর আইনের কচ্‌কচি, রুলরেগুলশনের মারামারি সহ্য হয়। য়ুনিয়নের যাবতীয় কাজকর্ম করেস্‌পণ্ডেন্‌স্ তাকে চালাতে হয়—এই হোম্ মিনিষ্ট্রীকে লেখো, এই অডিটর জেনারেলের কাছে আবেদন করো। অফিস মাষ্টারের অর্ডারের মধ্যে লীগাল্ ফ্ল বের করো—সর্বক্ষণ এইচিন্তায় আর একদিকে চার্জশীটের জবাব লিখে দিতে দিতে চন্দ্রশেখরের মাথাটা যেন একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে যায়। পুরোনো বইয়ের দোকান থেকে যে বইখানা সাত আনায় কিনে এনেছে সেটা পড়তে পড়তে পাশে সরিয়ে রেখে দিতে হয়েছে। কী ? না, য়ুনিয়নের কাজকর্ম করতে হবে সরকারী অফিসে য়ুনিয়ন করা মানে একমুখো রাস্তায় গাড়ী চালানো, সহকর্মী কেরাণীরা না বুঝলেও চন্দ্রশেখর বোঝে, আর অফিসের কর্তারা বোঝে বলেও চন্দ্রশেখরের ধারণা। না হলে মাসের পর মাস যায়, না দেয় কোনও উত্তর, না কাড়ে কোন রা'। ধৈর্যও যেন বেপথুমান হয়ে ওঠে। কী কুক্ষণে যে এই ঝামেলা ঘাড় পেতে নিতে গিয়েছিল।

চন্দ্রশেখর বিরক্ত হয়ে ওঠে। ঝাঁকি দিয়ে সরিয়ে দেয় ফাইলপত্তর, কলমটা ছিট্‌কে যায় কিছু দূর।

ঘুমটা ছেড়ে যায় কিছুক্ষণের জন্য হলেও।

আবার সদ্য-কিনে-আনা পুরোনো রঙ-চটা বইখানা টেনে নেওয়ার চেষ্টা করে। কতোদূরে পড়্‌তে পড়্‌তে ছেড়ে দিয়েছিল সেটা ঠিক করে বের করার আগেই আবার চোখদুটোর পাতা ভারী হয়ে আসে।

এক ফুঁয়ে বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে টান-টান হয়ে শুয়ে পড়ে। চন্দ্রশেখরের এটা একটা অভিনব বাতিক। কলকাতার বিজলীবাতিতে দৈনন্দিন কাজকর্ম

চলে। তাই বলে পড়াশুনাটাও চালাতে হবে, এটা ও ভাবতেই পারে না। বইয়ের পাতাগুলো কেবল আলোয় স্বচ্ছ উজ্জ্বল হয়ে উঠুক, আর ঘরের চারকোণ, বইখাতা পত্তরের আড়াল-আবডালগুলো থোকা থোকা অন্ধকারে রহস্যময় হয়ে থাক—এইটে ভালো লাগে চন্দ্রশেখরের ; বিজলীবাতিতে সেটি হওয়ার জো নেই। ও তাই রাতে মোমের আলোয় পড়ে। অমন স্নিগ্ধ আলোয় যেন আগুনের স্বভাবধর্ম রুক্ষতা নেই।

সারারাত পড়তে পারে চন্দ্রশেখর। সারারাত ফাইলপত্তর নিয়ে কাটিয়ে দিতে পারে সে। ওর শুয়ে পড়বার খানিক পরেই যে বুলু—ওর ছোট বোন—চা নিয়ে আস্‌বে তা-ও ও জানে। ঘুম-ঘুম চোখে ও সে চা-টুকু খেয়ে ফেলবে। ওদিকে তখন হয়ত পূবের দিকে একটু ফরসা রঙ দেখা যাবে। কিংবা হয়ত পাশের বাড়ির মেয়েটা গলা সাধার আগে হারমোনিয়মের দুটো রীড্‌ জোরে টিপে ধরবে।

তবু সে পড়ে পড়ে ঘুমুবে, একেবারে টানা ন'টা নাগাদ। তারপরে উঠবে ঘুম থেকে—একছুটে বাথরুম, তারপরে নাকে-মুখে দু'টো গুঁজে ড্যালহোসিমুখো যে কোন একখানা বাসে উঠে বসবে।

চাকরীজীবনের শুরু থেকেই চন্দ্রশেখরের এই নিয়ম।

চন্দ্রশেখরের বাবা অনেক বলেছেন, ভালোভাবে চাকরীটা কর। অফিসের পরীক্ষা-টরীক্ষা দাও, মোটা অংকের মাইনে না পেলে জীবনে দাঁড়াতে পারবে না। কী হবে এই সব হৈ-হৈ করে, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে। যতো সব ঝুটঝামেলায় সময় নষ্ট করা কি আমাদের মধ্যবিত্তদের সাজে।

অবশ্য কথাগুলো তিনি সরাসরি চন্দ্রশেখরকে বলেন না, শুনিয়েও বলেন না, মায়ের মারফত শোনে সে, তাই কথাগুলোর ধার যেন অনেকখানি ভোঁতা হয়ে যায়। সুতরাং বাবার কথা ওর ধর্তব্যের মধ্যে নেই, এক অনিচ্ছাকৃত অবহেলায় আমল দেয় না সে। অবহেলা বটে, অশ্রদ্ধা নয়। পরিচিত জনতার সরণীতে চলার নিতান্ত অনীহা চন্দ্রশেখরের, তাইতে এই অবহেলা।

বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ে চন্দ্রশেখর। শোয়া মাত্রই ঘুম আসে না। শোয়ার কয়েক সেকেণ্ড আগে চোখ দুটো কেমন আঠালো হয়ে উঠ্‌ছিল বিছানায় গড়িয়ে পড়া মাত্র সেই অনিবার্য ঘুমটা যেন পালিয়ে গেল।

রাত্রিটা যেন ওর দেহের চারপাশে জীবন্ত হয়ে ওঠে—সারাটা পরিপার্শ্ব যখন অচেতন সুষুপ্তিতে আচ্ছন্ন তখন একা-একা জেগে থাকতে ওর ভালো লাগে। মোমের আলোক শিখার বাইরে রাত্রির দেহটাকে ও যেন ছুঁতে পারে, ধরতে পারে দু'হাতের মুঠোয়। মোমের নিবাতকম্পিত শিখা দেখে ওর মনে হয় রাত্রি যেন দু'হাতে টেনে ধরতে থাকে আলোর শিকড়কে। এই যোঝাযুঝিতে ক্ষয়ে আসে মোমের আয়ু, আর শেষ পর্যন্ত রাতের শরীর।

কী অপরিসীম ক্লান্তি! চন্দ্রশেখর জুড়িয়ে আসে ঘুমে।

—দাদা, চা।

বুলুর নিত্যপরিচিত আহ্বান।

চন্দ্রশেখর পাশ ফিরে শোয়। হয়ত-বা সার্সির বাইরের আকাশটার দিকে তাকাতে চেষ্টা করে। দেখে রাত্রির বয়স ঠিক করার আগেই মাথাটা ওর বালিশের ওপর মাথা নেতিয়ে পড়ে।

—দাদা, চা দিয়ে গেলুম।

দ্বিতীয়বার জাগিয়ে দিয়ে বুলু চলে যায়।

যন্ত্রচালিতের মতো চন্দ্রশেখর চা-য়ে চুমুক দেয়। হাত বাড়িয়ে খবরের কাগজটা টেনে নিতে নিতে ডাক দেয়—বুলু।

বুলু যেন এ ডাকের জন্যে তৈরী ছিল। প্রায় সংগে সংগে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ায়।

—দে তো জানলাটা বন্ধ করে।

বুলুর বয়েস এখন ফ্রক ছেড়ে শাড়ীতে উত্তীর্ণ হওয়ার মতো হয় নি যদিও তবু জানালাটা বন্ধ করতে করতে একটু মুখ টিপে হাসে—মানসীদি অতো সুন্দর করে গায়—

তুমি ডাক দিয়েছো কোন সকালে
কেউ তা জানে না।

কিন্তু দাদার তা পছন্দ হয় না। ওর মুচকি হাসি হয়ত ঘুম-ঘুম চোখেও চন্দ্রশেখরের নজর এড়ায় না; এ শুধু আজ বলে নয়; মাঝে মাঝেই ও লক্ষ্য করেছে মানসীর গান, ওর বিরক্তি প্রকাশ আর সেই সংগে বুলুর ভাবান্তর, মুচকি হাসি। হয়ত বা একটা করুণা। করুণা হয়ত ওই মানসীর প্রতি, মানসীর জন্যে এবং সেই সূত্রে হয়ত নিজেরই ওপরে মেয়ে হয়ে জন্মানোর জন্যে, ভালোবাসা নিতে গিয়েও ব্যর্থকাম হয়ে ফিরে আসার জন্যে। কিংবা হয়ত দাদার পরে তার

অড়ানো অনুকম্পা, যে অনুভূতি চন্দ্রশেখর নাড়িতে নাড়িতে বোধ করে, কিন্তু ব্যাখ্যা করে বলতে পারে না। বুলু যে এখনও স্কুলের বেড়া ডিঙোয় নি, তার মগজে এতো কথা জমা হয়েছে, চন্দ্রশেখরের তা মনে হয় না। বুলুর বয়সী স্থনীলের বোন মন্টি হলে না হয় এমন একটা কথা চিন্তা করা যেতো।

চন্দ্রশেখরের এসব কথা চিন্তা করতেও হাসি পায়। স্থনীলের বোন মন্টি সব বোঝে। চন্দ্রশেখরের সংগে ঠাট্টাও করে স্থতরাং সে সব বোঝে ; আর বুলু লাজুক বলে এবং চন্দ্রশেখর তাকে কখনও কাউকে ঠাট্টা করতে দেখেনি বলেই বুলু এ সব কিছু বুঝবে না। চন্দ্রশেখর নিজের যুক্তির কাছে নিজে হার মানে।

নিজের কাছে হেরে যাওয়ার মতো বড়ো পরাজয় আর কোথাও নেই, আর কিছুতেই নেই। আর বিশেষ যখন সে পরাজয়ের ব্যাপারটা এতোটুকু একটা মেয়ে বুলুর জন্যে হচ্ছে। স্থতরাং দোষটা কারো ওপরে না চাপাতে পারলে স্বস্তি নেই, স্থখ নেই, ভীষ্মের শরশয্যার মতো প্রতিক্ষণেই বিঁধছে বিছানাটা। রাগে অস্বস্তিতে, বোকামিতেও বটে, চন্দ্রশেখর পাশ ফিরে শোয়। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, দেবে দু'কথা শুনিয়ে মানসীকে পরদিন। সোজা গিয়ে ডেকে এনে বলবে—

—তুমি আমার ঘুম ভাঙাও কেন রোজ রোজ?

মানসী চম্‌কে যাবে। হয়ত বলবে,

—আপনার ঘুম কি ভাঙে সত্যি? ঘুম ভাঙার তো এমন মূর্তি হয় না!

এমন কথাও ওই মেয়ে বলতে পারে। তখন চন্দ্রশেখর কী বলবে? কিংবা যদি আর একটা গানের থেকে দু' লাইন গুণগুণিয়ে শুনিয়ে দেয় সে ভারী লজ্জার ব্যাপার হবে। মেয়েটার রূপ নেই, রঙ ফর্সা নয়, ভরসা কেবল এই যা, অমন মেয়ে বেপরোয়া হয় না। ও তখন মরিয়া হয়ে বলে বসবে।

—আমি কাউকে এই ভোর-সকালে ডাক দিই নি, স্থতরাং আমার কানের কাছে রোজ রোজ এই একই গান না গাইলে খুশি হই।

ঠিক এই ক'টি কথা ছুড়ে দিয়ে চন্দ্রশেখর চলে আসবে। এই প্রতিজ্ঞা ঠিক করে মনে মনে চন্দ্রশেখর ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু কোন দিন আর ঐ কথাগুলো বলা হয় নি। উপরন্তু বুলুর মুচকি হাসি, চাউনি ওকে আরও বেশি জব্দ করে। এমন ভাবনাও ওকে ঘিরে ধরে, মানসীকে কি তবে সে ভালোবাসে, না হলে কটা কথা বলে দিলে যখন একটা এস্‌পার ওস্‌পার সহজেই হওয়া যায়, তখন চন্দ্রশেখর বলে ফেলতে পারছে না কেন। মানসীকে ভালোবাসি, কথাটা বার কতক উচ্চারণ করে দেখলো চন্দ্রশেখর। তারপরে হেসে উঠলো নিজেই। তবু

বুলুর কাছে একবারে ছোট হয়ে না যায়, এই জন্যে একদিন বল্‌লো, ঐ গান শুনলে আমার সকালের ঘুমটা মাটি হয়ে যায়, সারাটা দিন মনটা শরীরটা ম্যাজ্ ম্যাজ্ করতে থাকে। রবীন্দ্রসংগীত কি এ রকম মিয়োনো গলায় গায় নাকি ?

আজও গানটা শুনে ওর বিরক্তি লাগলো। সকালের ঘুমটাই বুঝি মাটি হয়ে যায়। বুলুকে জানালাটা বন্ধ করতে বলে পাশ ফিরে শোয়। আহা, রাত্রিটা কী আশ্চর্য সুন্দর। যে লোক ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিল এই রহস্যময় রাত সে বেচারার জীবনই বৃথা—কে বলেছে এই কথা, কে বলেছে। গ্যেটে ? শ' ? রবীন্দ্রনাথ ? ও-পাড়ার হরিদা ? না কি চন্দ্রশেখর ?

ঘুমের ভিতর চিন্তার সূত্র হারিয়ে ফেলে চন্দ্রশেখর।

হয়ত ন'টার পরেও ওর ঘুম ভাঙতো না। যেদিন ও রাত করে ফেরে সেদিন ন'টার আগেই ঘুম ভাঙে ; আর যেদিন সন্ধ্যেরাতে বাড়ী ফেরে সেদিন ওর ঘুম ভাঙতে দেরি হয়। হয়ত সেদিন অফিসে যেতে যেতে বারোটা বেজে যায়, কিংবা হয়ত যাওয়াই হয়ে ওঠে না। ছুটি কাটা যেতে যেতে শেষ পর্যন্ত মাইনে কাটা যায়, তবু নির্বিকার চন্দ্রশেখর। জীবনটা কী একেবারে অফিসের জোয়ালে আটকা থেকে কাটিয়ে দেওয়ার জন্যে, কলুর চোখ-বাঁধা বলদের মতো ঘুরে ঘুরে ক্ষয় করবার জন্যে। এই শতাব্দীতে যখন মানুষ প্রকৃতি জয় করে অগমলোকের রহস্য উন্মোচন করছে, যখন বেশি করে অবসর পাওয়ার নাম কেন সভ্যতা হবে না বলে দাবী উঠছে, তখন দশটা পাঁচটার অফিস আন্দামানে অন্তরীণ থাকতে হবে ভাবলেই চন্দ্রশেখরের মাথা ঘুরে যায়।

আধো ঘুম আধো জাগরণেয় মধ্যেও মাথাটা ঝাঁকি দিয়ে ওঠে।

—দাদা ?

ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে চন্দ্রশেখর—কী হয়েছে রে ?

—হরি-দা কে না যেন একজন ও-পাড়ার ডাকছেন তোমার।

—আচ্ছা।

বুলু চলে যায়। চন্দ্রশেখর অনিচ্ছা সত্ত্বেও আবার শুয়ে পড়ে।

সকালবেলা হরিদা'র আবির্ভাব একটু বিস্মিত করে ওকে। মূর্তিমান 'না' বলে যদি কল্পনা করা যায় কোন ব্যক্তিকে তবে হরিদা হলেন তাই। সারা পৃথিবীর দিকে তর্জনী তুলে আছেন যেন, তৈরী হয়ে আছেন সব কিছুকে নস্যাৎ

করে দেওয়ার জন্যে যেন। মানুষের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলে অথচ মানুষের থেকে তার সমাজ দূরে সরে না গিয়ে যে বেঁচে থাকা যায়, তা হরিদাকে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতো না চন্দ্রশেখর। অনেকের কাছে ও হরিদা'র গল্প করেছে, কেউই যে ওকে পুরোপুরি বিশ্বাস করছে, এ তার মনে হয় নি। কিন্তু হরিদা ওর কাছে মিথ্যে নয়, কিংবা হরিদা'র ব্যবহারে ভাণ আছে বলে ওর মনে হয় নি। জীবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে হরিদা কতোবার, কিন্তু যাকে বলে পিছু হটে চলে আসা তা ঘটে নি কখনও এ অর্ধশিক্ষিত লোকটার জীবনে! ওপরে ওঠবার সিঁড়ি খুঁজে পায় নি বলেই যে লোকের কাছে হাত পাততে সরমে বাধে তা নয়, আসলে হরিদা একটু চেষ্টা করলেই দুর্ভিক্ষ আর যুদ্ধের বাজারে কাজ গুছিয়ে নিতে পারতেন। কিংবা দেশ ভাগাভাগির বিড়াম্বনায় যাদের কপাল ফেটে দু'বার ভাগ হয়ে গেলো তাদের সংকীর্ণ হয়ে আসা পকেটের অবশিষ্টটুকুতে ভাগ বসাতে পারতেন। কিন্তু কেমনধারা মানুষ কে জানে, এককথায় ছেলে-মেয়ে-বৌয়ের হাত ধরে রাস্তায় দাঁড়ালো। মুখের ওপর নাকি কর্তাকে বলেছিল, এ চাকরী আমার পোষাবে না, এই পেট্রোলের টিনগুলোয় জল ভরে বিক্রি করা, কিংবা আপনার ঐ ধরণের চালের ব্যবসা।

এরপরে কোন মনিব চাকরীতে রাখে অবাধ্য কর্মচারীকে। এসব কথা চন্দ্রশেখর শুনেছে। বুদ্ধিমানদের যুগে হরিদাকে বোকা বলে ঠাওরাতে যখন পাড়ার কারোরই দ্বিধা হয় নি, তখন একদিন নিতান্ত বে-পাড়ায় অনেক দূরে দেখলো হরিদা "সাবান তরল আলতা চাই" হেঁকে চলেছে একটা গলি দিয়ে।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল চন্দ্রশেখর।

—থামলে যে!

ও আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল সামনে। স্মৃতি একটু বিস্মিত হয়ে বললো, ফেরিওয়ালা তো।

—না, ফেরিওয়ালা নয়, হরিদা!

—হরিদা!

স্মৃতি প্রথমটা বিস্ময়ে চেয়ে থাকে চন্দ্রশেখরের মুখের দিকে। তারপর ছোট মেয়ের মতো হেসে ওঠে। উচ্চকিত হয়ে ওঠে গলিটার দ্বিপ্রহর নিস্তব্ধতা।

—হাসির কী আছে এতে?

—আছে বৈ কি, যত্র-তত্র করুণা, অনুকম্পাবর্ষণ করাটা সব সময়ে মহৎহৃদয়ের লক্ষণ নাও হতে পারে। ওটাকে দুর্বলচিত্ত মানুষের পরিচয় বলে ধরা যেতে পারে।

—করুণা, অনুকম্পা বলছো কেন ? সহানুভূতি বলবে না কেন ?

—কী আশ্চর্য ! আমি তোমার মতো পড়াশুনা করি নি, অতো মায়া-মমতাও আমার নেই, কিন্তু এটা বুঝি যারা পৃথিবীর সব মানুষের দুঃখ মোচনের ব্রত নিয়েছে, তাদের পক্ষে বোধ হয় কোন স্বতন্ত্র মানুষের জন্যে দুঃখ করা সাজে না।

চন্দ্রশেখর ছেলেমানুষের মতো প্রশ্ন করে,

—কেন ?

—তাতে দুঃখ করাটাই বড়ো হয়ে ওঠে, তাদের জন্যে কোন কিছু করা বোধ হয় আর হয়ে ওঠে না। আমার তো এই ধারণা। এই কথাটাকে উল্টো দিক দিয়ে ধরো না। আমার দুঃখে আমি তোমার সহানুভূতি চাইলে সেটা দয়া দাক্ষিণ্যের পর্যায়ে পড়বে, অথচ একসংগে সব মানুষের সহানুভূতি জাগাতে পারলে তাদেরও চৈতন্য হয়, আমারও কিছু একটা করবার আগ্রহ বাড়ে।

—কথাটা বোধ হয় ঠিক বলেছ। কিন্তু তোমার দুঃখটা কি ?

স্মৃতি চন্দ্রশেখরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপরে ম্লান নিঃশব্দ হেসে বললো,

—না, আমার আবার দুঃখ কি।

চন্দ্রশেখর ভাবে, হরিদা'র দুঃখ আর স্মৃতির দুঃখে অনেক তফাৎ আছে। হরিদা'র বেঁচে থাকার সংগ্রাম তার পরাজয়ের দুঃখ আর স্মৃতির তা নয়। তার আরো ভালোভাবে বাঁচার জন্যে ব্যর্থতার দুঃখ। একথা একেবারেই স্বীকার করে না সুনীল, ওর স্কুলের বন্ধু এখন মাষ্টারী করে। সুনীল হেসে উড়িয়ে দেয়, বলে,

—তোমার স্মৃতির দুঃখকে বিলাস বলা যায়, যাকে ইংরেজিতে বলে হাইপো-কোন্ড্রিয়া, বুঝলে ?

—এতো সহজে কোন জিনিসের সমাধান করে দেওয়াকে আমি কেতাবী বুদ্ধি বলি।

চন্দ্রশেখর একটু উচ্চকণ্ঠেই বলে। সামান্য উষ্মার তাপ থাকে তাতে।

—কারণ ?

সুনীল প্রশ্ন করেছিল।

—কারণ আবার কি। একটি মেয়ে জীবনের প্রথমেই প্রবঞ্চিত হয়েছে, নিজের মনের মতো করে সংসার করার স্বপ্ন তার শুরুতেই ভেঙে তছনছ হয়ে গেলো, সমাজে তার দাঁড়াবার জায়গা রইলো না। আফিসে পুরুষ-কেরাণীর মধ্যে

যাকে সব সময়ে কাজ করতে হয়, ভবিষ্যৎ বলতে গেলে যার আজীবন চাকরীর পর পেনসন নিয়ে কোথাও একটা আস্তানায় আশ্রয় নেওয়া, নিজের বলতে যার কিছু রইল না ; হওয়ার সম্ভাবনাও যার কিছুমাত্র নেই, তার দুঃখকে বিলাস বললে একটু বেশি বলা হয় নাকি ?

চন্দ্রশেখরের উত্তেজিত বক্তৃতার ধরণের কথা শুনে সুনীল একটু হাসলো।

—তুমি আমার কথাটা ঠিক ধরতে পারো নি, আমি স্মৃতির বর্তমান অবস্থার কথা ভেবে বলছি।

সুনীল বোঝাবার চেষ্টা করে।

—তুমি ভুলে যাচ্ছো, দু'দিন বাদে কী হবে, এটা যারা ভাবতে পারে, দুঃখের বেগটা তাদের কাছেই প্রবল হয়ে ওঠে। বর্তমানকে নিয়ে যারা ব্যস্ত তারা দুঃখ বলো, সুখ বলো কোনটাকেই বেশি জোরে আঁকড়ে ধরতে পারে না। হরিদা'র দুঃখ বর্তমানকে নিয়ে, স্মৃতির দুঃখ ভবিষ্যৎ ভেবে।

সুনীল সেদিন চুপ করে গিয়েছিল।

চন্দ্রশেখর সুনীলের থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে বললো,

—কী, আমি কি ভুল বলেছি ?

না, ভুল আর কি। তবে আমি ভাবছি, কারো সংগে কারো দুঃখের তুলনা হয় কি না।

সুনীলের কথাটা ওর মনে লেগেছিল। কারো সংগে কারো দুঃখের বা সুখের তুলনা হয় না।

—দাদা।

বুলু আবার ডাকে। চন্দ্রশেখর চোখ মেলে চায়।

—দাদা, হরিবাবু বলে গেলেন তোমায় আজ অবশ্য অবশ্য ওঁদের বাড়িতে যেতে হবে। না গেলে চলবে না। এতক্ষণ বসে থেকে চলে গেলেন উনি। তুমি কিন্তু যেও, ভদ্রলোক খুব করে বলে গেছেন আমায় তোমায় বলতে।

বুলুর কথা শুনে বা হরিদা'র বক্তব্য শুনেও চন্দ্রশেখরের কোন ভাবান্তর হলো না। নিষ্পলক চোখে বুলুর চলে যাওয়াটা দেখলো কেবল, আর খবরের কাগজখানা চোখের সামনে শুয়ে শুয়েই ধরে রাখলো।

সুনীল যে সিনিক্ হয়ে গেছে, এবং না হওয়া ছাড়া তার আর উপায় নেই,

চন্দ্রশেখরের মনে সেইটেই বার বার উঠে পড়ে। পৃথিবীর কোন জিনিসকেই সে খুব সোজা ভাবে দেখতে পারে না কোনো লোককেই সে ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারে না। অবশ্য এ দোষ তার আয়ত্ত করা ; পৃথিবীই তার জীবন বদলে দিয়েছে। চন্দ্রশেখর কতোবার বোঝাবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু স্থনীল সে-সব কানেই তোলে না ; আসলে ও ভুলে গেছে চন্দ্রশেখরদের চোখ নিয়ে দেখবার সর্বসাধারণ স্বভাবটা।

—দেখেছ কখনও নিজের চোখে বুড়ো অন্ধ বাবা ষ্টেশনে ষ্টেশনে ভিক্ষে করছে, ছেলেমেয়েদের ফাঁকি দিয়ে? আর সেই পয়সা দিয়ে সংসার চালাচ্ছে, শুনেছ? ভদ্রলোক হয়েও যাকে ভিক্ষে করতে হয় এমন বাপের ছেলে হয়ে জন্মেছ?

স্থনীলের এ কথার উত্তর চন্দ্রশেখর দিতে পারে না, বোধ হয় কেউই পারে না। স্থনীলের দারিদ্র্যের খবর ও যে জানেনা তা নয়। একবার বন্যা না জানি কিসের জন্যে পাড়ায় রিলিফের চাল-পয়সা সংগ্রহ করতে বেরিয়েছিল চন্দ্রশেখর দলবল নিয়ে। মনে আছে স্থনীলদের বাড়িতে যেতেই স্থনীল ঘরের ভেতর থেকে বেরুলো না, স্থনীলের বাবাও সামনে দিয়ে লাঠি ঠক্-ঠক্ করতে বেরিয়ে গেলেন। সাম্‌নে এলেন স্থনীলের মা। তাকে দেখেই যা ওর প্রথম মনে হলো সেটা দুর্ভিক্ষের সময়ে খবরের কাগজের একটা কার্টুন ; সেই কার্টুনটাতে ক্ষুধাখিন্ন অর্ধবিবস্ত্রা নারীমূর্তির নিচে লেখা ছিল, বঙ্গ আমার জননী আমার, আমার দেশ। চন্দ্রশেখর স্থনীলের মা-কে দেখে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ছিল। সেই প্রথম স্থনীলের বাড়িতে গিয়েছে, এর আগে কখনও কোনওদিন সে স্থনীলদের বাড়িতে যায় নি, স্থনীল যেতে বলে নি বলেই ; বস্তীর অনেক বাড়িতেই সে হয়ত গেছে, কিন্তু স্থনীলদের বাড়িতে নয়?

—বাবা, তোমরা কী জন্যে এসেছ?

স্থনীলের মা সরু গলায় জিজ্ঞেস করেছিল।

—আমরা রিলিফের চাল-পয়সা তুলতে এসেছি।

অতি নিস্পৃহ গলায় চন্দ্রশেখর উত্তর দিয়েছিল, মনে মনে ভাবছিলো, এখানে না এলেই হতো। কী দরকার ছিল এদের দারিদ্র্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে, বেশ ত' চুপচাপ ছিল নিজেদেরই কোটরে।

—কিন্তু আমরা ত' দিতে পারবো না—

চন্দ্রশেখর সংগে সংগে বল্‌তে যাচ্ছিল, ঠিক আছে তাতে কী হয়েছে, না পার্‌লেন 'ত' না-ই পারলেন কিন্তু ভদ্রমহিলা ওর কথা শুরু করার সংগে সংগে বললেন,

—তোমরা তাই বলে ফিরে যেতে পারবে না। অনেক চাল-পয়সা তোমরা তুলেছ, কিন্তু পয়সা থাক, চাল আমাদের কিছু দিয়ে যাও, না হলে ত' এককথায় তোমাদের যেতে দিতে পারিনে।

সুনীলের মা'র এই কথায় দলের একটা ছেলে কিছু বল্তে যাচ্ছিল, চন্দ্রশেখর তাকে থামিয়ে দিয়ে নিজে হাতে খানিকটে চাল ভদ্রমহিলার নোংরা শাড়ীর আঁচলে ঢেলে দিলো।

এ ঘটনা চন্দ্রশেখর ভুল্তে পারে না। দারিদ্র্যকে এমন অনাবৃত করে ধরার যে মনোভাব সেদিন সে দেখেছে তার জন্যেই আজও সে সুনীলকে দোষ দিতে পারে না, চায়ও না। বরং সুনীল সিনিক্ না হলেই যেন বেমানান হতো। অবশ্য কোন অবস্থাতেই বোধ হয় চন্দ্রশেখর নিজেকে এমন ভাবে বে-আব্রু করতে পারতো না, এখনো পারে না। সে একটু অর্থনৈতিক দারিদ্র্য নয়, যে-কোন প্রকারের অভাব-অনুপপত্তির কথা সে যেন মুখ ফুটে বল্তে পারে না। এমনকি ক্ষিধে পেলেও তার যেন কোথায় সংকোচ হয় সে-কথা বল্তে ; অসুস্থতার কথা বলতেও তার কেমন বাধো বাধো ঠেকে। এ শিক্ষা অবশ্যই তার বাবার কাছ থেকে পাওয়া। বাবার সংগে তার কোন দিক থেকেই মেলে না, কোনও উপদেশ বোধ হয় মনে রাখে নি তাঁর, কিন্তু একটা কথা ছাড়া। সেটা কোন এক মহেন্দ্র মুহূর্তে ওর মগজে ঢুকছে, তারপর থেকে দীর্ঘ দিন সে-কথাটা আর হাজারো কথার মধ্যেও মনের একটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশে ঠিকই রয়ে গেছে। বাবার স্বভাবের বিপরীত চন্দ্রশেখরের স্বভাব ; অথচ বাবার ঐ গুণটি তার রপ্ত হয়ে গেছে। একবার এক অসুখের সময়েও খুব চীৎকার করছে যন্ত্রণায় অসোয়াস্তিতে, বয়েস তখন খুবই অল্প। বাবা ঘরে ঢুকে বল্লেন,

—দেখো ; জানি তোমার খুবই কষ্ট হচ্ছে, বুঝি তা, কিন্তু তোমার অসুখ সারা বাড়ি অসুস্থ হয়ে থাক্বে, এটা তো ঠিক নয় ; চীৎকার কর্লেই যে তোমার কষ্ট আর একজন বুঝতে পার্বে, তা-ও নয়। তাই যতোদূর সম্ভব চীৎকার না করে দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে থাক।

বাবা সেদিন এমন আস্তে আস্তে এমন একটা সুরে কথাগুলো বলেছিলেন যে কথাগুলো নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন মনে হলেও বাবাকে নিষ্ঠুর হৃদয়হীন পাষাণ বলে মনে হয় নি। কথাগুলোর ভেতর দিয়ে যেন পুত্রের প্রতি পিতার সহস্রধারা স্নেহ ঝরে পড়ছিল।

কিন্তু সেদিন থেকে চন্দ্রশেখর নিজের কথা, কষ্ট দুঃখ, যন্ত্রণা অসুবিধে, কোনোটাই দশজনকে শোনাতে ভুলে গেছে।

তাই আজ যখন বাড়িতে মা চায়ে চিনি দিতে ভুলে যান তখনও সে কথা বলে না; কিংবা অফিসে দশজনের চার্জসীটের উত্তর কী ভাবে লিখতে হবে বলে দিতে দিতে ঘণ্টা কয়েক সন্ধ্যের পর কাবার হয়ে যায়, তখনও সে মুখ বুঁজে থাকে। তাই বলে অন্যায় জেনে তার মুখোমুখি হতে এতোটুকু দেরী হয় নি। সেবারে অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট সেনশর্মা ওকে একটু বেগ দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, সংগে সংগে সে তার প্রতিবাদ করেছিল।

—দেখুন, আজ বেলা দুটোর মধ্যে কাজগুলো করে দেবেন।

বলেছিল সেনশর্মা।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে চন্দ্রশেখর বলেছিল,

—এ-কাজ আজই আমায় শিখতে হবে, তারপরে এতো কাজ অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দেওয়া কি সম্ভব হবে?

—ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক্তৃতা দেওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব হয়, আর এটা সম্ভব হবে না কেন?

—কাজটা জান্‌লে হয়ত সম্ভব হতো। কিন্তু একমাস ধরে যে কাজটা অন্য একজন করে গেলেন, তিনি তার কন্‌সলিডেশন না করে রেহাই পেলেন, আর আমায় এতোটা কর্‌তেই বা হবে কেন আজকেই?

সেনশর্মা রাগী লোক, অফিসের সকলেই জানে, তার মুখের ওপর এমন জেদাজেদি করা বিস্ময়কর শুধু নয়, ভবিষ্যৎ আশঙ্কা ও আতঙ্কজনক। কিন্তু চন্দ্রশেখর নির্বিকার!

—কোন কৈফিয়ৎ আমি আপনাকে দেবো না, আপনি না পারলে আপনাকে আমি ওয়ার্থলেশ বলে রিপোর্ট করবো।

—দেখুন, মিঃ সেনশর্মা, আপনি বার দশেক পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে তবে অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট হয়েছেন, আমি সে পরীক্ষা একবারও দেইনি, তাই আমি কেরানী, তাই বলে ওয়ার্থ হবো আমি, আর আপনি আমার নামে তাই বলে রিপোর্ট কর্‌বেন!

অফিসে সেদিন প্রায় ভূমিকম্প হওয়ার মতো। যারা এতোদিন চন্দ্রশেখরকে চিন্‌তো না, দু'হাজার লোকের বাকি সে ক'জন ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তার নামের সংগে, চেহারার সংগে পরিচিত হয়ে গেলো।

কিন্তু কেরানী চন্দ্রশেখর, ইউনিয়নের নেতা চন্দ্রশেখর ফাইলের বাইরেও যে বিরাট বিস্তার্ণ আর বিচিত্র জগৎ রয়েছে তার সংগে পরিচিত। সেখানেও সে বাবার কাছ থেকে শোনা কথাগুলোকে মূলধন করে রেখেছে। রোজ রোজ মানসী তার বেমানান গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলেও এবং তাতে নিদ্রার ব্যাঘাত ছাড়াও সৌন্দর্যবোধে আঘাত লাগ্‌লেও চন্দ্রশেখর বিরক্তিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে নি। কিংবা স্মৃতি সম্বন্ধে সুনীলের অহেতুক আক্রমণে ও ব্যথিত হলেও, যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছে সুনীলকে, কিন্তু সে ব্যথার কণামাত্র প্রকাশ পায় নি। সুনীল হাসে ; অফিসের আরও অনেকে হাসে, ঠাট্টা তামাসা করে ;

—শেষকালে কি একজন বিবাহিতার সংগে প্রেমে পড়্‌লে নাকি ?

চন্দ্রশেখর উত্তর দেয় না।

কখনও হয়ত শৈলেন সংশোধন করে নিয়ে বলে,

—বিবাহিতা এবং স্বামী-সুখভোগ-বঞ্চিতার সংগে শেষ পর্যন্ত !

শৈলেনের থিয়েটারী ভাষার কথাগুলো ঘনিষ্ঠ দু'চারজনের হাসির খোরাক হয়। তাতেও চন্দ্রশেখর চটে না, একটাও কথা বলে না। ও এমন করে তাকিয়ে থাকে যার পরে আর কোনও কথা বলা চলে না। সুতরাং আক্রমণ বাধা না পেয়ে কমজোরি হয়ে পড়ে সব আক্রমণের মতো। এমনকি স্মৃতি যেদিন আফিসে আসে নি দৈবাৎ সেদিন হয়ত চন্দ্রশেখরও আসে নি, হয়ত সে নিজেই জান্‌তো না অফিসে যাবে কি যাবে না, যেতে ভালো লাগলো না বলেই হয়ত গেলো না, তাই নিয়ে সকলে মিলে কম ঘোঁট পাকায় না ; পরের দিন আফিসে গেলে অনেকেরই চোখেমুখে কৌতুক-কৌতূহল আর জিজ্ঞাসার সাক্ষাৎ পেয়েছে সে, তবু সে-সবে প্রতিবাদ দূরস্থান কখনও তার মনের খবর জান্‌তে পারে নি কেউ। শূন্য অর্থহীন গহন তার মুখের একটা স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হয়ে গিয়েছিল। সব দেখে শৈলেন বলেছিল,

—দেখো চন্দ্র, লোকে বলে তোমার ঐ উদাস-উদাস দৃষ্টিরও একটা অর্থ আছে।

—আছে নাকি সত্যি !

—নিশ্চয়ই আছে। তবে আমার মনে হয় তোমার ঐ শূন্য চাউনির সংগে কোথাও যেন একটা বিস্ময়ের খাদ মেশানো আছে।

—বিস্ময়ের খাদ ! সেটা আবার কি বস্তু ! বিস্ময়টা কি খারাপ কোন ব্যাপার ?

—দেখো চন্দ্র, আমি তোমায় চিনি। সত্যিকার বোকা লোকেরা কিন্তু

কখনও বিস্মিত, হতভম্ব হয় না। সে সবচেয়ে নিশ্চিন্ত, সবচেয়ে নিশ্চিত। তোমার এই বিস্ময়টাকে আমি বল্‌বো, বোকা লোকের মধ্যেও কখনও কখনও নাড়া খেয়ে বুদ্ধি জাগ্রত হয়ে ওঠে ক্ষণিকের জন্যে, এটা তাই। তুমি অভিনয়টা ভালোই জানো।

—বোকারা কি অভিনয় করতে পারে? স্টেজেই পারে না, ত' বৃহত্তর জীবনের স্টেজে! কী যে বলো তুমি? তাছাড়া আগে আমায় বোকা বলে শেষে অভিনয় করতে পার কথাটা বলে কি সব কাঁচিয়ে দিলে না?

—কথাটা আমি কী বলেছি তুমি জানো, হয়ত গুছিয়ে বল্‌তে পারছিনে; তাছাড়া তুমি কথাটা ভালোই বল্‌তে পারো।

—দাদা!

—বুলু আবার আসে।

—কী ব্যাপার রে?

এবার চন্দ্রশেখর উত্তর দেয়। বুলুকে আসতে দেখে ওর আর এক পেয়ালা চায়ের নেশা উগ্র হয়ে ওঠে। বুলু কিছু বলার আগেই বলে ফেলে,

—হাঁরে, আর এক কাপ চা খাওরাতে পারবি, আধ কাপ হলেই চলে যাবে, এই একটুখানি?

বুলু হাসে।

—হাসছিস্ যে, পারবি কিনা তাই বল। তোর জন্যে আজ নিশ্চয়ই একটা ভালো গল্পের বই নিয়ে আস্‌বো।

—ঠিক বল্‌ছো আন্‌বে।

বল্‌লুম তো।

—আচ্ছা, বেশ, খাওয়াব চা। কিন্তু তুমি কী আজ আফিসে যাবে না? বেলা কতো হয়েছে জানো?

—ক'টা বাজে?

সাড়ে ন'টা বেজে গেছে সেই কখন? যাবে না বুঝি আফিসে?

চন্দ্রশেখরের নিস্পৃহতায় হতাশ হয়ে পড়ে।

—যাবো। চা খেয়েই উঠ্‌বো।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও চন্দ্রশেখর অফিসমুখো হয়। দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত যেন এক বন্দীশালায় কাটানো। পান থেকে চুণ খস্‌লে যেখানে হৈ-চৈ শুরু হয়ে

যায়। চারিদিকে ফাইল, চিঠিপত্তর, টাইপ্‌রাইটার আর কম্‌টোমিটারের বিদ্‌ঘুটে গা ঘিন-ঘিন-করা আওয়াজ। বাড়ি থেকে যতো দূরে সরে আসতে থাকে ততোই মনটা ওর হাঁপিয়ে ওঠে। পুরোনো ফাইলপত্তর আর অতীতের খরচের বর্তমানে হিসেব কষার মধ্যে যেন ও তিলে তিলে মৃত্যুর ছায়া দেখে। যতো দিন যায় ততোই যেন এই কেরানীগিরির অক্টোপাস ওকে ঘিরে ধরে তারপরে সমস্ত রক্ত শুষে নিতে থাকে। ওই লাল বাড়িটা কেরানীর রক্ত খেয়ে খেয়ে যার রঙ হয়ে গেছে লাল। রক্ত শুষে নেয় তার প্রমাণ সব কেরানীই চোখে কম দেখে, ড্যালহৌসীর পুকুরটার নাম লালদীঘী রাখা যেমন যুক্তিসংগত হয়েছে, তেমনি বহুবাজার স্ট্রীট আর এস্‌প্লানেড ঈষ্ট ও ওয়েষ্ট ধরে সারি সারি চশমার দোকান ঐ লালবাড়িটার রক্তলোলুপতার কথা সঠিকভাবেই স্মরণ করিয়ে দেয়। শুধু দেহ মরে যায় না, চন্দ্রশেখরের ধারণা, দেহের মৃত্যু তুচ্ছ, মনে মনে মরে গেছে সব ক'টা মানুষ।

লালদীঘীর আশেপাশের বাড়ীগুলোয় মানুষ নেই, আছে মানুষের লাশ। ও-ও মরে যেতো যদি না ইউনিয়নের কর্মী হতো। চন্দ্রশেখর বলে,

—ছোটোবেলার গল্পে শুনেছি, ভূতের ভয় পেলে চিম্‌টি কেটে দেখতে হয়, তবেই ভূত ছাড়ে। আমাদেরও তেমনি অবস্থা, বেঁচে আছি কিনা পরখ করার জন্যে ইউনিয়ন করি।

—শুধু এই কারণে ইউনিয়ন করো, কর্তাদের সঙ্গে ঝগড়া করো?

স্মৃতি বিস্মিত হয়। খাটের ওপর আধ-শোয়া হয়ে শুয়ে ছিল সে, উঠে বসেছিল একেবারে মুখোমুখি হয়ে চন্দ্রশেখরের। কথা বল্‌তে বল্‌তে সেদিন কখন কলকাতার বাড়িগুলোর পেছন দিয়ে সূর্য অস্ত গিয়ে ছিল, রাস্তায় দিনের আলো নিভবার সংগে সংগে বিজলী বাতি জলে উঠেছিল, দু'জনের কেউ টের পায় নি। স্মৃতির ঝি দু'বার চা দিয়ে গিয়েছে, দু'বারই তারা সদ্ব্যবহার করেছে তার।

—শুধু এই কারণে হলো? এটা কি যথেষ্ট কারণ নয়? না কি তোমরা বলো মানুষগুলো এমন কি ঐ চিমটি কাটার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলবে? দেহ ত' অসাড় হয়ে আছে, কিন্তু ইচ্ছেটুকুও থাকবে না?

—তা বলছি নে, বলছি, কারণ না থাকলেও ঝগড়া করবে কেন?

—ঐটেই তো কারণ—চিরস্থায়ী কারণ, অভাব-অভিযোগের সংগে এ-ও আছে। তুমি সবে ঢুকেছ অফিসে, এখনও মন বসে নি বলেই অতো আলাদা করে ভাবতে পারছো।

—মন বসে নি, না, তোমার ঐ লালবাড়ি আমাকে এখনও চিবিয়ে খাওয়ার সুযোগ পায় নি, কোন্‌টা ?

—দুটোই একই কথা। চাকরী করে টাকা আনাটা আর তা দিয়ে সংসার চালানোটা যখন একবারে অপরিহার্য হয়ে উঠবে তখনি বুঝতে হবে ঐ লালবাড়ি তোমায় খেতে আরম্ভ করেছে, তখনই ছটফট করবে ; আর সেইটেই তখন খুব খারাপ লাগবে। বাইরের দরজা বন্ধ হলেই দেখবে ভেতরে আলো-বাতাস আর ঢুকছে না। তোমার তো সেই অবস্থা নয়। যাক্‌ অনেক গল্প হয়েছে, হঠাৎ দেখা হয়ে গেলো তাই অনেক কথা হলো। কিন্তু আফিসে যাও নি কেন সেটা তো এতক্ষণে বুঝতে পারলাম না।

—তুমিও তো যাও নি !

—আমি যাই নি কারণ আমার যেতে ভালো লাগে নি বলে, তা'ছাড়া অন্য কাজ ছিল। এবারে উঠি, সন্ধ্যে হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। একটা কাজ আছে।

—কাজ তো আছেই। আর একটু বসো, আবার চা খেয়ে উঠবে।

—বেশিক্ষণ নয়। আলোটা জ্বালো, দেখতেই পাচ্ছি নে কিছু ! মুখ না দেখলে কথা বলাও যায় না ; শোনাও যায় না।

—না, আলো জেলো না, মাথা ধরেছে ভীষণ। আলোতে কষ্ট পাই। বাইরের আলোয় ঘর ত' খুব অন্ধকার নয়।

চন্দ্রশেখর চুপ করে বসেছিলো আরও কিছুক্ষণ। অন্ধকার গাঢ় হয়ে এসেছিল ঘরের মধ্যে কখন খেয়াল হয় নি ওর। স্মৃতি ওর হাতখানা টেনে নিয়ে নিজের কপালে রাখলো। মাত্র কয়েকটি উত্তপ্ত মুহূর্ত। এক লহমায় স্মৃতির মনের চেহারাটা পরিষ্কার হয়ে যায় ওর কাছে। একটু বিস্মিত হয় ও! এমন কোন দুর্বলতা ওর দিকে থেকে ছিল না যার জন্যে এই সাহস স্মৃতির হতে পারে। শৈলেনের কথাটা ওর মনে হয় ; তবে কি সত্যি-সত্যি স্মৃতিকে ও ভালবাসে।

—আচ্ছা, আজ চলি।

উঠে দাঁড়ালো চন্দ্রশেখর, পা বাড়ায় ঘরের বাইরে।

—কী হলো, পালাচ্ছ না কি ?

ঝাপসা আলোয় স্মৃতিকে কেমন অশরীরী মূর্তি বলে মনে হয় ওর, হঠাৎ কোন পথ-হারিয়ে-আসা পথিককে যেন আপন খপ্পরে পেয়ে গেছে। চন্দ্রশেখর কি ওর শিকার আজ অ-নে-ক দিনের অপেক্ষার পরে !

—না, পালাবো কেন।

অত্যন্ত শান্ত গলায় বললো ও।

—পালাচ্ছ-ই তো।

হাসিতে যেন ভেঙ্গে পড়ে। স্মৃতি বাইরের আলো-এসে-পড়া ঘরে ওর ঝক্ ঝকে দাঁতগুলো কেমন বীভৎস দেখায়। নিরুত্তর দাঁড়িয়ে থাকে চন্দ্রশেখর।

—কথা কইছো না যে?

—কী শুনতে চাও?

—সে-কি আমি বলে দেবো?

খানিকক্ষণ স্মৃতির মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে নিষ্ক্রান্ত হলো চন্দ্রশেখর নীরবে।

—দাঁড়াও, সিঁড়ির আলোটা জেলে দিই। পড়ে গিয়ে শেষটায় বিপদ ঘটাবে।

খুব সহজ সুরে বল্‌লো স্মৃতি।

রাতের স্মৃতির সংগে অফিসের স্মৃতিকে মেলাবার চেষ্টা করতে করতে বেরিয়ে পড়েছিল রাস্তায়। সুদেষ্ণা একটা বড়ো খাঁটি কথা বলেছিল সেদিন; বলেছিল

—জানেন, মেয়েরা ছেলেদের যতোখানি অধিকার করে রাখে, রাখতে পারে, ছেলেরা মেয়েদের ততোখানি অধিকার করে রাখতে পারে না। আসলে আমরাই তাদের গ্রহণ করি; অবশ্য ওরা বলে ওরাই নাকি আমাদের গ্রহণ করে।

—গ্রহণ করেন, না গ্রাস করেন?

—যা বলেন; গ্রাসই করি। আপনি সব কথা এমন হালকাভাবে নেন!

—তা সত্যি, এমন একটা অনেষ্ট কন্‌ফেসন্ মেয়েদের তরফ থেকে আপনি করলেন, তার মূল্যটা আমি বুঝলাম না।

বলে চন্দ্রশেখর মুচকি মুচকি হাসতে থাকে।

—একে স্বীকার-উক্তি বলছেন কেন, যা সাধারণত ঘটে থাকে তাই-ই ত' বললাম।

—ঘটে যা তা-ই বলতে হবে এমন বুদ্ধি আপনাকে কে দিল?

—তা অবিশ্যি ঠিক; তবে কথাগুলো যদি কোন ছেলের মুখ দিয়ে বেরুতো তাহলে কিন্তু তাকে মেয়েরা আর ছেলেরা দু'দলই বোকা বলতো। আর আমি বললাম বলে আপনি এটাকে স্বীকার-উক্তি ধরে নিলেন! কথাটা তো আর মিথ্যে নয়।

সেদিন আর কথা এগোয় নি, কী একটা কাজে অ্যাকাউন্ট্যাণ্ট সুদেষ্ণাকে

ডেকে পাঠিয়েছিল ; চন্দ্রশেখর সেক্সন-এ গেলেই দেবনারায়ণবাবু অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট স্থদেষ্ণাকে ডেকে পাঠাবেই। আর চন্দ্রশেখর দিনের মধ্যে একবার দু'বার গিয়ে স্থদেষ্ণার পাশে চেয়ার টেনে নিয়ে ঘণ্টা এক-দুই কাটিয়ে দেবে। ওর যাওয়াটা যে দেবনারায়ণবাবু পছন্দ করে না, এটা ও জানে। আর জানে বলেই ও কারণে-অকারণে যাবে।

স্থদেষ্ণা কিন্তু কথা খাঁটি বলেছিল। স্মৃতির সংগে সন্ধ্যেবেলা দেখা না হলে হয়ত চন্দ্রশেখর একথার সত্যতা পুরোপুরি অনুসরণ করতে পারতো না। ব্যাপারটা না বুঝলেও ঠিক এমন ধরনের একটা জিনিস যে ফল্গু স্রোতের মতো ছেলে মেয়ের সম্পর্কের মধ্যে, পরিচয়ের মধ্যে, চলতে থাকে সেটা ও এখন যেন উপলব্ধি করতে পারে। আফিসের যে ছেলেটিকে সে সত্যি অপছন্দ করে সেই দেবজ্যোতি ছেলেটির কী হ্যাংলামি না চন্দ্রশেখর লক্ষ্য করেছে ! ঐ হ্যাংলামির জন্যে ও অপছন্দ করে ওকে। কতোদিন দেবজ্যোতি ওকে ধরেছে' রেণুর সংগে পরিচয় করিয়ে দিন, স্থদেষ্ণার সংগে পরিচয় করিয়ে দিন।

—আপনি নিজে গিয়ে পরিচয় করুন না, কেউ ত' আপনাকে বাধা দিচ্ছে না। আমাকে কে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল ওদের সংগে ?

—আপনার কথা স্বতন্ত্র। আপনার মশায় মেয়েদের সংগে মেশবার একটা পার্টস আছে।

—কী যা তা বক্‌ছেন। কথাগুলো ভেবে বলেন ?

ঝাঁঝের সংগে বলেছিল চন্দ্রশেখর। এতো বিরক্ত বোধ হয় ও কারো ওপরই হয় নি। কিন্তু বেচারার জন্যে দুঃখও হয় ওর। যাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে টাক-পড়ে-আসা দামী পরচুলোয় ঢাকে, সাধ্যাতিরিক্ত খরচ-খরচাও হয়, বেশভুষায় মাইনের টাকার চেয়েও বোধ হয় বেশিই ব্যয় হয়। তবু তার একান্ত কাম্য মেয়ের সান্নিধ্য জোটে না, অথচ এতোগুলো কেরানী মেয়ের ভিড়ের মধ্যে 'তাকে দিনের পর দিন কাজ করতে হয়। সান্নিধ্য ত' জোটেই নি, বরং যাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে তার এতো ঐকান্তিক আগ্রহ তাদের কাছ থেকে দেবজ্যোতি সম্বন্ধে এতো অভিযোগ শুনতে হয় চন্দ্রশেখরকে যে একদিন ওকে গিয়ে সাবধান করে দিতে হয়েছিল।

তাই মনে হয় স্থদেষ্ণার কথাই ঠিক। স্থদেষ্ণারা যদি দেবজ্যোতিকে আমল দেয় তবেই তার কপাল ফিরলো, না হলে বেচারার দুর্গতির শেষ নেই। অথচ কোন রেণু, কোন স্থদেষ্ণা যদি একবার তাকে প্রসন্ন হাসিতে অভিনন্দিত করে,

তবে তার পর দিনেই দেবজ্যোতি হয়ত বলবে, হয়ত কেন, বলবেই, এবং আরও অনেক দেবজ্যোতিই বলে থাকে, হাঁ ভাই, বিয়ে একটা করতে হবে, তাই একেই করলাম।

কিন্তু ঐ গ্রহণ করা কথাটার বদলে স্মৃতির বেলায় গ্রাস করা কথাটাই বোধ হয় চন্দ্রশেখরের মনে হয় সঠিক। স্মৃতি ওকে গ্রাস করতে চায়।

অন্যমনস্ক হয়ে চলতে চলতে হোঁচট খেলো চন্দ্রশেখর। চপ্পলের জীর্ণ ফিতেটা ছিঁড়ে গেলো। হঁাটতে হঁাটতে অনেকটাই চলে এসেছে। রাস্তার বাঁকে স্মৃতিদের বাড়িটা আর দেখা যাচ্ছে না। বোধহয় দেখা যাচ্ছে না, চন্দ্রশেখরের আর পিছন ফিরে তাকাবার ইচ্ছাটাও নেই, সমস্তটা দেহ মন মগজ জুড়ে কী এক নাম-না-জানা অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

চপ্পলের ফিতেটা ছিঁড়ে যেতেই ওর সম্বিৎ ফিরে এলো। এতোক্ষণ হাত ঘড়িটার দিকেও তাকাবার ওর ইচ্ছে ছিল না। র‍্যাপারের ভেতর থেকে বের করার মতো প্রচুর শক্তি যেন ও' এই শীতের সন্ধ্যেয় হারিয়ে ফেলেছে। রাস্তার বিজলী বাতিগুলো একএকটা স্বপ্নের ঠুলি লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে খানিকটে অন্তর অন্তর। দোকানের শো-কেসগুলোতেও যে আলো সেও অনেক নিষ্প্রভ, সেও যেন স্বপ্নের মায়াজাল বিছিয়ে দেয় মনের ওপর। দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। শীতের সন্ধ্যের কলকাতার সঙ্গে অন্য সময়কার সন্ধ্যের তফাৎ এইখানে, শীতের সন্ধ্যেটা অনেক মসৃণ মোলায়েম মায়াঘন আর অন্য সময় তার ঔজ্জ্বল্য জ্বালা ধরিয়ে দেয় চোখে আর মনে।

চন্দ্রশেখর একটুক্ষণ দাঁড়ালো। একটা ফিতে ছিঁড়ে গিয়ে তাকে অচল করে তুলেছে। চলমান গাড়ি-ঘোড়া মানুষ যানবাহনগুলো ওর চোখের সামনে চলচ্চিত্রের মতো চলে যাচ্ছে। বেবাক্ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এমন করে গতির দৃশ্য দেখার সুযোগ আজ জীর্ণ চপ্পলের জীর্ণ ফিতেটার দৌলতেই সম্ভব হলো। রোজই তড়িঘড়ি কাজ করে যেতে হয়, বিনা কাজে এমন নির্ভেজাল অবসর বড় একটা আসে না। গতির মধ্যে থাকলে গতির পরিচয় পাওয়া যায় না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর এই কথাটাই মনে হতে লাগলো।

হয়ত অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতো, কিংবা হয়ত একটা রিক্সা ডেকে বাড়িতে পৌছুতে পারতো। কিন্তু জনপ্রবাহের বাইরে অমন নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে থাকতে

দেখলে অন্যের দৃষ্টি পড়ে অকারণে। ভাবনার রোমন্থনে ও এতোই মশগুল হয়ে গিয়েছিল যদি না ওর কাছে এসে ট্যাক্সিটা উৎকট হর্ণের আওয়াজ করতো তবে কতোক্ষণ যে ঐ ছেঁড়া চপ্পলটাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো বলা কঠিন।

ট্যাক্সিটা হর্ণ দিতে ও একপাশে সরে দাঁড়ালো। আস্তে আস্তে গাড়িটা ওর পাশ দিয়ে সামনে এগিয়ে গেলো।

গাড়ীর ভিতরে দৃষ্টি পড়তেই চন্দ্রশেখরের সমস্ত সত্তাটি যেন ঝাঁকুনি খেয়ে গেলো। ছেলেটিকে ত' সে চেনেই ; মেয়েটিকেও বটে। কিন্তু শৈলেনের সংগে পারুলের যোগাযোগটা কোথায় ঘট্‌লো কেমন করে তা ওর মাথায় ঢুকলো না। কিছুদিন আগে হরিদা ওকে বলেছিল,

—জানো, চন্দ্র, আমার বড় মেয়ে পারুল একটা চাকরী পেয়েছে।

—তাই নাকি! বেশ সুখবর ত।

চন্দ্রশেখর খুসি হয়ে বলেছিল। এবং প্রশ্ন করেছিল,

—কোথায় পেলো চাকরী? মাইনে কতো মাসে?

—মাইনে যে কতো তা ঠিক করে বলে নি। তবে নাইট ডিউটি দিতে হবে, এইটে যা অসুবিধের।

হরিদার গলায় কেমন যেন বিষণ্ণতার স্বর।

—তাতে কি হয়েছে। আজকাল কতো মেয়েই তো রাত্তিরে চাকরী-বাকরী করছে। রাত্তিরে কাজ করতে হবে যখন তখন মনে হচ্ছে টেলিফোন অফিসে টফিসে কাজ পেয়েছে বোধ হয়। ভালোই হয়েছে। আপনার মেয়ে তো বেশি লেখাপড়া জানে না? চাকরী পেয়েছে, এই তো যথেষ্ট।

চন্দ্রশেখরের কথায় হরিদা যেন একটু আশান্বিত হয়ে ওঠে।

—তাহলে ভয়ের কোন কারণ নেই বলো?

—ভয়ের আবার কি আছে? নাঃ আপনার সত্যি মাথাটা খারাপ হয়েছে।

আশ্বাস দিয়ে হরিদাকে আশ্বস্ত করেছিল বটে সেদিন চন্দ্রশেখর। কিন্তু ওর মনেও একটা খট্‌কা লেগেছিল। টেলিফোন অফিসে কাজ করবার নিম্নতম যোগ্যতাও যে পারুলের নেই একথাটা ত' তার অজানা নয়। তাছাড়া চাকরী বললেই আজকাল চাকরী পাওয়া যায়, এটাও কেমন কেমন অস্বাভাবিক ঠেকছে।

এ সমস্যারও তার সমাধান করতে বেশিদিন লাগে নি। আকস্মিকভাবেই সে সমস্ত জিনিসটায় রহস্য। পিপিং থেকে সুদেষ্ণার সংগে বেরিয়ে বাসে সুদেষ্ণাকে তুলে দিয়ে চন্দ্রশেখর হাঁটতে হাঁটতে মেট্রোর দিকে আসছে। খানিকটা দূর আসতেই পারুলের সংগে একেবারে মুখোমুখি হয়ে গেলো।

—কী রে, পারুল, কোথায় চলেছিস ?

—চন্দরদা আপনি !

—হ্যাঁ আমি। তা কোথায় চলেছিস ?

বলে চন্দ্রশেখর পাশের সুবেশ তরুণটির দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকালো। ইঙ্গিতটা পারুল ধরতে পারলো।

—ইনি আমাদের সংগে কাজ করেন পবিত্রবাবু, আর ইনি চন্দ্রদা।

পারুলের বুদ্ধি বেশ খুলেছে, পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ধরন বেশ রপ্ত করেছে। চন্দ্রশেখর মনে মনে হাসলো, কিন্তু বিচলিত হলো। আর একবার ওর জিভের ডগায় এলো 'কোথায় চলেছিস' কিন্তু প্রশ্ন না করে ও বললো, 'আচ্ছা, চলি রে' বলেই সুবেশ তরুণটিকেও বিদায় জানালো।

সমস্ত ঘটনা ওর চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। কোন রাস্তায় পারুল চলেছে, এটা বুঝতে ওর বেশিক্ষণ লাগে নি। একথা হরিদাকে বলেও কোন লাভ নেই, হরিদা'র শীর্ণ চেহারার একটু রক্তের আভাস লেগেছে, জীর্ণ পোষাকে নিঃপয়সার দীনতা কমেছে। ওই বেশ। তাছাড়া, আর একটু আগে যদি চন্দ্রশেখরের সংগে সুদেষ্ণাকে ঘুরতে দেখতো পারুল ও ঐ তরুণ যুবকটি, তাহলে কী ভাবতো ওরা। তফাৎটা মাত্র এক জায়গায়, একটাতে মন দেওয়া-নেওয়ার খেলা কিংবা খেলার ছল, আর একটায় দেহ কাড়াকাড়ির পালা।

মন থেকে পারুল-ঘটিত দুর্ভাবনা ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিল চন্দ্রশেখর মেট্রো পর্যন্ত পৌঁছাবার আগেই। তারপরে আজ আবার শৈলেনের সংগে দেখে ওর মনটা কেমন বিষিয়ে উঠলো। ইচ্ছে হলো ওর এক্ষুনি গিয়ে ওদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ওদের চমকে দেয়, ইচ্ছে হলো, শৈলেনের হাত ধরে টেনে এনে অনেক আলোর সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। আফিসের অনেক মেয়ের সংগে মেশবার সুযোগ যার ছিল, যাদের কোন একজনকে বিয়ে করে সে ঘর-সংসার শুরু করতে পারতো, তার এই দেহ-ব্যবসায়ের খরিদ্দার হওয়া কেন। কথায় কথায় একদিন শৈলেনকে বলেছিল মনে পড়ছে।

—তোমাদের ব্যাপার আমি বুঝিনে। একটা হিল্লে তো নিজেরাই করে

নিতে পারো। সে স্বাধীনতা কি তোমাদের নেই ?

—স্বাধীনতা নেই, যথেচ্ছাচার করার ক্ষমতা রয়েছে।

মহাকৌতুকের হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে শৈলেন বলেছিল।

—কে উদ্যোগ করবে বলো বিয়ের ? বাবা-মা-দাদা ? নৈব নৈব চ। অথচ যদি নিজেরা বিয়ে করি, বলবে, ছেলে বয়ে গেছে। নিজে যে গিয়ে বলবো, বিয়ে করছি, সে সৎসাহস নেই স্বীকার করি, তাহলে উপায় থাকে একটিই। তা এখনও বোধ হয় মনের বাঁধন অতো আলগা হয় নি।

একনাগাড়ে কথাগুলো বলে গিয়েছিল শৈলেন।—তাছাড়া ধরো, কিছু মনে করো না, এই আমাদের আফিসের গীতা, স্বদেষ্ণা, রমা এদের কাউকে যদি ভালোবাসি আর বিয়েও করি তখন চাকির দায়ে ভাই মনসা বিক্রি হয়ে যাবে ; ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোবে না।

বলতে বলতে শৈলেন চোখ টেপে, চন্দ্রশেখরের কিন্তু চুপ করে থাকা ছাড়া তার অন্য গতি নেই, কারণ, আলোচনা এতোখানি ব্যক্তিগত স্তরে চলে আসবে ভাবেনি সে। তখনি সে চলে গিয়েছিল স্বদেষ্ণার টেবিলে। যথারীতি শব্দ সাড়া করে চেয়ার টেনে নিয়ে পাশে বসেছিল।

—কী ব্যাপার ! হঠাৎ যে !

স্বদেষ্ণা ওর মুখের দিকে এক পালক চেয়ে ফাইলে চোখ রেখেই বলেছিল।

—কী আবার ব্যাপার ! আসতে বারণ নেই ত !

—তা অবিশ্যি নেই। এই তো কতোক্ষণ আগে এসেছিলেন, এমন সময়ে তো আসেন না তাই জিগ্যেস করলাম।

—হুঁ।

একটা গম্ভীর আওয়াজ করে চন্দ্রশেখর। অনির্দিষ্ট অর্থহীন আওয়াজ।

—কী, হলো কী। আফিসের কাজ হয়ে গেছে ?

—কাজ ? কাজ আবার কোনদিন করি আমি ? আমার তো ফাঁকিবাজ নামই আছে।

—তাই বুঝি অ্যাকাউন্ট্যাণ্টের ধমক খেয়ে চলে এলেন ?

—ধমক খেয়ে বুঝি আপনার কাছে চলে আসতে হয়।

কথাটা বলে ফেলে চন্দ্রশেখর অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো। মুখ তুলে দেখে স্বদেষ্ণা তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। রোখটা ওর আরও চড়ে যায়।

—আপনারা কি বলুন তো

—কেন, আমরা কি করলাম?

সবিস্ময় প্রশ্ন করেছিল সুদেষ্ণা।

—আচ্ছা, আপনারা এতো সাজগোজ করেন কেন? এতো সব জামা কাপড় গয়না?

—বয়েস বেশি হলে ছোটোদের মতো একটু রংয়ের দিকে নজর যায়, একটু আড়ম্বর মন্দ লাগে না।

চন্দ্রশেখর ভেবেছিল, ওর এ প্রশ্নকে একেবারে ছেলেমানুষী বলে উড়িয়ে দেবে সুদেষ্ণা, হয়ত একটু লজ্জা পাবে। কিন্তু এমন সপ্রতিভ উত্তর দিলো যে সুদেষ্ণা যে এই ওর প্রথম মনে হলো, সুদেষ্ণা স্মার্ট বটে, উদ্ধত নয়।

—তা হঠাৎ এমন কি ঘট্‌লো যে একেবারে ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে এই প্রশ্ন?

—এমনি।

—উঁ-হুঁ, এম্‌নি মুখ অতো আষাঢ়ের মতো হয় নাকি!

—হয়েছে না কি?

—আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ান, তাহলে দেখতে পাবেন হয়েছে কি হয় নি।

—জানেন ত' আয়নায় কখনও মুখের স্বাভাবিক অবস্থা ছাড়া অন্য অবস্থা দেখা যায় না; সুতরাং আয়নায় মুখ দেখলে কিছুই বোঝা যাবে না। অন্যের মুখের আয়নায় নিজের মুখ দেখতে হয়।

—কথায় তো পারার যো নেই আপনার সংগে।

—আচ্ছা, চলি।

—আসবার অনুমতি নিয়েছিলেন যে যাওয়ার অনুমতি চাইছেন?

—বেশ, অনুমতি না নিয়েই যাচ্ছি।

—শুনুন, একটা কথা বলি, অবশ্য কথাটা আমার নয়, আপনার। আপনার মনে নেই বোধ হয়, তাই আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি মাত্র।

চন্দ্রশেখর হাসতে থাকে।

—হাসছেন যে?

—একেবারে ছাপার হরফে কথা বলছেন। তা কথাটা শুনি।

—বলেছিলেন, মেয়েদের একটু খোসামোদ করতে হয়, মন জুগিয়ে চলতে হয়, বুঝতে দিতে হয়—

—মেয়েরা ভিন্ন জীবন একেবারে সাহারা মরুভূমি, এই তো?

—আপনি কিন্তু আপনার কথাকে বিদ্রূপ করছেন।

—আচ্ছা, বেশ, চুপ করলাম, বলুন এবারে।

—বুঝতে দিতে হয় তারা খুব ইম্‌পরট্যাণ্ট। কারণ তারা নিজেদের ইম্‌পরট্যাণ্ট ভাবতে বেজায় ভালবাসে। সেই অবসরে আপনার খুসিমতো তাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে হয়। কিন্তু তারা যদি বুঝতে পারে তারা কতোটা ইম্‌পরট্যাণ্ট তা হলে কিন্তু তারা উদ্ধত হয়ে উঠবে, আর আপনাদের মানে পুরুষের জীবন তখন দুর্বিসহ হয়ে যাবে। বুঝলেন?

নিজের কথা সুদেষ্ণার মুখে শুনে শৈলেনকে একবার বলবে ভেবেছিল চন্দ্রশেখর, কিন্তু আর বলা হয়ে ওঠে নি। কথাগুলো শৈলেনের বোধ হয় কাজে লাগতো, ওর নিতান্ত সিনিকের মতো মনোভাবটাও বোধ হয় কেটে যেতো। তাহলে বোধ হয় আজ এই শীতের সন্ধ্যায় পারুলের সংগে ট্যাক্সি করে ওকে আর ঘুরে বেড়াতে হতো না।

চন্দ্রশেখর বাড়ী ফিরে এলো রাত্রি অনেক হওয়ার আগে। স্মৃতি পারুল, শৈলেনকে মন থেকে মুছে ফেলে দেওয়ার জন্যে বই নিয়ে বসলো। কিন্তু বই খোলা থাকে—চোখ বইয়ের পাতায় নিবদ্ধ হলেও মন অন্যত্র বইয়ের পাতা থেকে বহু দূরে ঘুরতে থাকে।

সকলকে ওর সিনিক্ মনে হয়, হরিদা, সুনীল, শৈলেন এমন কি প্রেমকাঙাল দেবজ্যোতিকেও ওর সিনিক্ মনে হয়। তার চেয়ে অভয়বাবু, গোকুলবাবু বা শ্রীধরবাবুর মতো বাপের বয়সী কেরাণীদের অনেক বেশি জীবন্ত বাস্তব, অনেক বেশি স্বাভাবিক মনে হয় ওর। এমন কি যারা হরতালের দিনেও সহকর্মীদের চোখে ধুলো দিয়ে আফিসে এসে চাকরী বজায় রাখে বা রাখার চেষ্টা করে, ওর মনে হয়, তাদের একটা জীবন আছে, একটা নীতি আছে সমগ্র অস্তিত্বে। তারা যেন-তেন-প্রকারে বাঁচতে চায়। শূন্যবিত্ত শূন্যচিত্ত। ওরা সরলরেখা। কিন্তু এরা তো বক্ররেখা নয়; সুনীল, শৈলেন, দেবজ্যোতিরা হলো জ্যামিতির সেই বিন্দু—দৈর্ঘ, প্রস্থ, বেধ নেই, তবু আছে অস্তিত্ব।

বেঁচে যেতো ; একটা যে কোন অজুহাত যদি মনের কাছে মোটামুটি একটা কার্যকরী যুক্তি নিয়ে উপস্থিত হতো তাহলে ও অফিসে যাওয়া বাতিল করে দিতো এককথায়। কিন্তু হাতের কাছে তেমন যুক্তি দুর্লভ হলো। মনে মনে হাতড়ে বেড়াতে লাগলো কোন-একটা লাগসই যুক্তি। ভেবে দেখলো রাত্তিরে ঘুম না হওয়ার জন্যে শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করছে কি না ; কিন্তু না শরীরটা ওর যথেষ্ট মহাশয় ব্যক্তি, বিনিদ্র রজনীর অস্বাভাবিককেও এ দেহ তার স্বাভাবিক করে নিয়েছে। একদা ওর আফিসে যেতে ভালো লাগতো' সেই প্রথম চাকরীতে ঢোকার সময়ে। লোকে বলে, চাকরীতে প্রথম ঢোকার সংগে সংগে মন বসে না ; স্কুল-পালানোর মতো আফিস কামাই করা বেশ মজার ব্যাপার বলে মনে হয় ; কিন্তু ওর ঠিক উল্টেটো ঘটেছে। প্রথম প্রথম সে পরম আগ্রহে আফিসে যেতো। দেখে শুনে ওর বাবা ওর মাকে ডেকে বলেছিলেন।

—ছেলেটার দেখি সুবুদ্ধি হয়েছে' চাকরীতে খুব আগ্রহ। এমনটা হবে ভাবি নি।

মা ওর পক্ষ হয়ে বলেছিলেন,

—ওর কথা তুমি কোনদিন ভেবেছো? তোমার তো ধারণা ওর কিছু হবে না।

চন্দ্রশেখরের বাবা মা-র কথায় রণে ভঙ্গ দিয়েছিলেন।

কিন্তু সে চন্দ্রশেখরে আর আজকের চন্দ্রশেখরে অনেক ফারাক। চাকরী আফিস এই নিয়ে ওর কৌতুহল মিটেছে, এ খবর বাবা বা মা কারো কাছে এখনই পৌঁছায় নি। তাহলে বাবা এবং মা-তে আবার এক পশলা কথার বিনিময় হতো যেটা চন্দ্রশেখরের পক্ষে প্রীতিপ্রদ হতো না। চাকরীর প্রথম দিকটা ওর কাছে ছিলো প্রেমের প্রথম পরিচ্ছেদের মতো ; যৌবনের স্বতোচ্ছলতা যেমন প্রথম প্রেমে মাদকতা আনে, মনে মনে তার রিহার্সালের প্রয়োজন হয় না, তেমনি। হৃদয় তখন অভিজ্ঞতায় পাকে না, তাই সব কিছু না ভেবে করা যায়, না বুঝে বলা চলে। চন্দ্রশেখরের মন এমন বুদ্ধিতে পরিপক্ক ; এখন তাই তার আফিসে যাওয়ার আগে রিহার্সালের প্রয়োজন, পশ্চাতে কোন প্রম্পটার না থাকায় সে পাট ভুলে যায়, আফিসে যাওয়ার পার্ট, চাকরী করার পার্ট।

তবু অফিসে যায় সে। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বেও। অসুখ হলে ওষুধ খেতেও বোধ হয় ওর এতো খারাপ লাগে না। কি বিশ্রী যে লাগে আফিসে যেতে ! সকালটাই মাটি হয় আফিসে যাওয়ার আতঙ্কে, তারপরে যেমন-তেমন করে স্নান

খাওয়া সেরে, একটা বাস কিংবা ট্রামে বাদুড়-ঝোলা হয়ে আফিসে গিয়ে বসা আর সেই পুরানো-পুরানো ফাইল ঘেঁটে কী সব অনাবশ্যক কাজকর্ম! পুরোনো ফাইল নিয়ে কাজ করতে করতে মনটাই কেমন বুড়ো হয়ে যায়, পুরোনো হয়ে যায়। ইংরেজরা দেশটাকে হাতের মুঠোয় রাখার জন্যে কেরাণীগিরির যে উৎপাত সৃষ্টি করেছিল, এখনও সেই ঠাট বজায় আছে তাজা জোয়ান ছেলেগুলো মাঝ বয়েসে বুড়িয়ে দেওয়ার জন্যে। এ নিয়মের আর রদ-বদল হলো না। নিজের জায়গাটাতে বসে চন্দ্রশেখর রোজ একবার করে তাকিয়ে দেখে চারিদিকে—কেমন পান চিবুতে চিবুতে বুড়োর দল আসছে, যক্ষ্মারোগীর ফ্যাকাশে হাসি হাস্‌তে হাস্‌তে আসছে শৈলেন, সুরেশ্বর, রমেশ, অনিল আরও অনেকে শতে শতে। ওদের মুখে যেন কেমন একটা নির্জীব নিশ্চিন্ততার ছাপ। এমন কি হালে যে মেয়ের ঢুকেছে চাকরীতে তারা না আছে মেয়ে, না হতে পেরেছে পুরুষ, সব বৃহন্নলা যেন। চন্দ্রশেখরের মনে হয়, আচ্ছা, যদি ওর মা এই আফিসে এই বয়েস পর্যন্ত চাকরী করতেন তাহলে কেমন হতো, কেমন লাগতো তাঁকে? ও যা হয়েছে, তাই কি হতে পারতো? ভাবে, এই সব মেয়েরা যারা বিয়ে করেছে, যারা হয়ত ঘরসংসার করছে নিজের নিজের, তাদের ছেলেমেয়েরা কেমন হবে? কী রকম চিন্তা করতে শিখবে সমাজ-সংসার-মা-বাবা সম্বন্ধে?

ভাবতে ভাবতে ওর হাসি পায় একসময়ে। যতো সব বাজে চিন্তায় মাথাটা না-হক গরম করা। ও একদিন জিগ্যেস করেছিল গোকুলবাবুকে।

—আচ্ছা, গোকুলদা, আপনার আফিসে আসতে ভালো লাগে?

—তা লাগে বৈকি।

একটু যেন চিন্তা করেই বলেছিলেন গোকুলবাবু।

—লাগে সত্যি সত্যি?

—লাগবে না কেন। ভালো লাগে তার কারণ না লেগে উপায় নেই বলে।

—আমি তা বলছিনে। এখন ত' লাগতেই হবে, সে নয়। বলছি, ভালো লাগতো যখন ঢুকে ছিলেন প্রথম?

—হাঁ তাও লাগতো, কারণ বুঝে গিয়েছিলাম জীবনে আর কিছু হবে না। তোমাদের মতো কিছু-একটা করতে হবে, এমন কোন আদর্শের মাদকতা ছিল না।

চন্দ্রশেখরের ভালো লেগেছিল উত্তরটা। কিছু একটা করার চিন্তা যাদের একবার পেয়ে বসেছে, যা-পেয়েছি তাতে খুসি হতে না-পারার মনোভাব একবার

যদি শিকড় গাড়তে পারে মনে, তবে আর রেহাই নেই কোনক্রমে। সে মরেছে। তার বর্তমান বিবর্ণ, ভবিষ্যৎ ধূসর।

চন্দ্রশেখরের তাই আফিসে যেতে ভালো লাগে না। অথচ এমন একটি বড় বিরাট উঁচু দেয়ালের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে যে অস্থিরতাই শুধু বাড়ে, দেয়াল অতিক্রমের কোন আন্তিক চেষ্টাই আর হয় না।

চন্দ্রশেখর গোকুলবাবুর উত্তর শুনে গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল, এটা সে বুঝতে পারে নি নিজে, মনে মনে যে রোমন্থন করছিল সেটা লক্ষ্য করেছিলেন গোকুল বাবু। তাই তার চেতনা ফিরে এলো যখন গোকুলবাবু বললেন,

—কী হলো! আদর্শের মাদকতা আছে না কি হে?

একটু হেসে চন্দ্রশেখর বললো,

—আছে কি না মনটা খতিয়ে দেখছি, গোকুলদা।

—দেখো হে, ভালো করে দেখো, তারপর তাড়াতাড়ি একটা ডিসিসান্ নিয়ে নাও, ঝট্‌পট্। নাহলে দেখবে জীবনটাই বরবাদ হয়ে গেছে। আমরা ডিসিসান্ নিতে পেরেছি, তাই—কেরাণী হয়েও জীবনটা বরবাদ হয় নি, দায়িত্ব এড়িয়ে যাই নে। আসল কথা হলো ডিসিসান্, বুঝলে। সময়মতো একটা ফাইনাল ডিসিসান্।

আসল কথা যে ডিসিসান্ নেওয়া—একটা সুনির্দিষ্ট প্রত্যায়ত সিদ্ধান্তে আসা, এটা চন্দ্রশেখর বোঝে। আশ্চর্য হয়ে যায়, অতো চমৎকার কথাগুলো গোকুল-বাবু কতো নিস্পৃহ শান্ত নিস্তরংগ গলায় বলতে পারেন। কিন্তু ডিসিসানে আমার ক্ষমতাটাও আজ ওর হাতে নেই, চারদিকের সফেন জীবন-সমুদ্রে কারোর একার ডিসিসনে কী আসে যায়।

একটা সুনির্দিষ্ট প্রত্যায়ত সিদ্ধান্ত। কথাটাকে ঘুরে ফিরে উচ্চারণ করে চন্দ্রশেখর। কেরাণীদের ইউনিয়নের অন্যতম নেতা সে, একটা সিদ্ধান্তে আসতে এবং আসাতে হিম্‌সিম্ খেয়ে যেতে হয়। এমন কি সেদিন যখন স্মৃতি ওর হাতটা তুলে নিয়ে ছিল সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকারে তখন কোন্ সিদ্ধান্তটা সে নিতে পেরেছিল। একটা মাত্র সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছিল, সেটা হলো নিচে নাম্‌বার সিঁড়িটার সন্ধান করা। তা-ও এর মূলে কতোটা স্বচেষ্ট ইচ্ছা ছিল, কতোটা বহুদিনাগত অভ্যাসায়ত সংস্কার ছিল সেটা ভেবে দেখার সময় পায় নি সে।

স্মৃতির বেলায় তবু ভুল হলেও একটা ডিসিসান্ সে নিতে পেরেছিল, হাতটা সরিয়ে দিয়ে উঠে পড়তে পেরেছিল, কিন্তু বেলা ভট্টাচার্যের বেলায় সেটুকুও সে সময় মতো নিতে পারে নি। কী চায় নি সে স্মৃতির কাছ থেকে সেটা সে জানে, কিন্তু কী চেয়েছিল সে বেলার কাছ থেকে তা আজও বোঝে না। মনের তলা হাতড়িয়ে কোথাও একটা মনোমতো ব্যাখ্যা খুঁজে পায় না। অথচ মুখ ফিরিয়ে নিতে তার দেরী হয়েছিল যথেষ্ট। স্মৃতির সংগে যদি আজ সে গোটা একটা দুপুর-বিকেল সন্ধ্যে কাটিয়ে দিতে পেরে থাকে তো সেদিন বেলার সংগে চা-পানে সময়টুকু কাটাতে না পারার কোন যুক্তি নেই। স্মৃতির মতো হাত বাড়িয়ে দেয় নি বেলা ঘনায়মান বাতি-না-জ্বালা অন্ধকারে, নিজের ঘরে পেয়ে চন্দ্রশেখরের মনটাকে ছিনিয়ে নিতে চায় নি কোনদিন সে। একান্তে পেতে চায় নি একান্ত করে পাবে এই আশায়। যে বয়েসটা লুকিয়ে-চুরিয়ে দেখে কাটানোর বয়েস সেই সময়টাতে কেমন শীতল নির্লিপ্ত নিরুত্তেজ ভাব সর্বাংগ জড়িয়ে থাকতো বেলার। একদিন তার ভীষণ প্রয়োজন পড়ল টাকার। নিরুপায় চন্দ্রশেখর বেলার কাছে গিয়ে হাজির হলো। চাইবে-কি-চাইবে-না করে রাতটুকু কাটিয়ে শেষটায় গেলো সে।

—হঠাৎ এতো সকালেই যে?

সদ্য ঘুম-থেকে-ওঠা ফোলা-ফোলা চোখে মুখে হাত বুলুতে বুলুতে স্বাভাবিক কণ্ঠে উত্তর-না-চাওয়া প্রশ্ন করলো বেলা।

—এই এমনি এসে গেলাম।

—বসুন, আসছি।

তারপর চা এলো। চন্দ্রশেখর একবার ভদ্রতার খাতিরে বেলার মা'র সংগে দেখা করলো, বেলার দাদার সংগে রাজনীতির দু'একটা কথা আলোচনা করলো। তারপরে বেলার ঘরে এসে বসলো। এ বাড়িতে তার যাতায়াত অনিয়মিত ছিল না একদা, তাই এখন অনিয়মিত হলেও আন্তরিকতার অভাব হয় না কোথাও।

—কী খবর বলুন।

—কী আবার খবর। ক'দিন যেন আসা হয়ে ওঠে নি, তাই চলে এলাম। তা আছো কেমন? কী করছো এখন? পরীক্ষা তো হয়ে গেছে?

চন্দ্রশেখর থামলো।

—অনেকগুলো প্রশ্ন একসংগে করলেন কিন্তু। কোন্‌টার উত্তর আগে দেই?

চন্দ্রশেখর মুখ তুলে তাকালো। বেলার গলায় যেন কেমন একটা ব্যঙ্গের ছোঁয়া

না-ও হতে পারে হয়ত। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বোঝবার কিছু নেই। ওর মুখ দেখে চন্দ্রশেখরের একটা কথা মনে পড়ে। বৃটিশ আমলে এক বিপ্লবীকে পুলিশ প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যখন উত্তর পেল না তখন অত্যাচারের ভয় দেখালো; বিপ্লবী হাসতে হাসতে নিজের পকেট থেকে দেশলাই আর সিগারেট বের করে সিগারেটটা ধরিয়ে দেশলাইয়ের কাঠির আগুনে নিজের বাঁ হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলের ঠিক নিচে ধরলেন। আঙুল পুড়ছে আর বিপ্লবী কথা বলে যাচ্ছেন।

—তোমাকে কিন্তু ভা-রী সুন্দর লাগছে!

চন্দ্রশেখর আল্‌তোভাবে বললো।

বেলা একবার তাকালো ওর দিকে, তারপরে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লো। এই প্রশ্নটা আজ সুদেষ্ণাকে করলে কী বলতো জানে না সে, তবে কিছু একটা বলতো যাতে চন্দ্রশেখরই লজ্জায় পড়ে যায়, কিংবা স্মৃতিকে করলে হয়ত—হয়ত কেন, নিশ্চয়ই হেসে উঠতো খিল খিল করে।

—তোমার কাছে একটা জিনিস চাইতে এলাম।

পলকের জন্যে চকিত হয়ে উঠেছিল বেলা। তারপর প্রয়োজন মিটিয়ে চলে এসেছিল, এবং আরও কতোবারই গেছে। প্রথমবারের সে মিষ্টি চমকিত হওয়া-টুকু আর ওর নজরে পড়ে নি। সেই বেলার বিয়ের দিন বাড়ির ঠিকানায় নেমন্তন্নর চিঠি পেয়ে চন্দ্রশেখর একটু ভাবতে বসেছিল। বেরিয়ে পড়েছিল সে ঠিকই রাত্তির যখন গড়িয়ে চলেছে মধ্যরাত্তিরের দিকে। পরের দিন সকালে গেলে হয়ত পৌঁছাতো গন্তব্যস্থলে। কিন্তু রাত এগারোটায় রাস্তার মাঝখানে মানসীর সংগে দেখা হবে এটা সে ভাবে নি। রাতের শো-য়ে সিনেমা দেখে ফিরছিল মানসী আর তার বান্ধবীরা। যার সংগে সে কোনও দিন কথা বলে নি, ভ্রূক্ষেপ করে নি যার অস্তিত্বে সে যে মাঝরাতে রাস্তার মাঝখানে পাকড়াও করে ওর বান্ধবীদের সংগে চন্দ্রশেখরে পরিচয় করিয়ে দেবে এটা তার দূরতম কল্পনারও বাইরে ছিল।

—এই চন্দ্রদা, কোথায় চলেছেন এতো রাত্তিরে?

—এই একটু এদিকে যাবো, দরকার আছে।

তাড়াতাড়ি করে পাশ কাটিয়ে যেতে পারলেই যেন বাঁচে চন্দ্রশেখর।

—খুব জরুরী দরকার আছে?

—তা একটু ছিল বৈকি।

—একটু। তা থাক, আসুন এদের সংগে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই।

পরিচয় শেষ করতে করতে ক'টা মিনিট কাটলো। যাই-যাই করেও ওদের পাশ কাটিয়ে যেতে পারলো না চন্দ্রশেখর। মানসীর বন্ধুরা সুযোগটাকে ছাড়লো না। ওরা সমস্বরে বললো,

—ভালোই হয়েছে, আপনি বরং মানসীকে ওর বাড়িতে পৌঁছে দিন; আমাদের দেরী হয়ে যাচ্ছে। মাসিমাকে কথা দিয়েছিলাম মানসীকে বাড়িতে পৌঁছে দেবো আমরা। তা আপনি যখন এসে পড়লেন, তখন—

—তখন আর ভাবনা কি, এই তো?

চন্দ্রশেখর ওদের কথা শেষ করতে দেয় না।

—ঠিক তাই!

ওরা-ও হাসতে হাসতে বলে।

নিরুপায় চন্দ্রশেখর বেলাদের বাড়িতে যাওয়ার আশা ত্যাগ করে বাড়ির পথ ধরে মানসীর সংগে। বড়ো বেশি গায়ে গা লাগিয়ে চল্ছে যেন মানসী। নিস্তব্ধ নির্জন রাস্তা দিয়ে এইভাবে চলতেও যেন চন্দ্রশেখরের লজ্জা করে। তাছাড়া, মানসীর কথা তো কোনও দিন ভাবে নি সে। বরং ওর বেসুরো রবীন্দ্রসংগীত ওকে অনেক দূরে নিয়ে গেছে মানসীর কাছ থেকে। তবু অবস্থা বিপাকে চলতে হয় একসংগে।

—কথা বলছেন না যে?

মানসী স-কৌতুকে প্রশ্ন করে।

—কী কথা বলার আছে?

—বলার নেই বা-রে! এই যেমন, কী ছবি দেখলে? ছবিটা কেমন লাগলো? কার অভিনয় ভালো হয়েছে? এতো রাত্তিরে সিনেমা দেখে ফেরা উচিত হচ্ছে কি? এমনি ধরণের হাজারো প্রশ্ন করে কথা বলে যাওয়া যায়।

মানসী হেসে ফেলে। মেয়েটি বেশ কথা বলতে পারে। তবু চন্দ্রশেখর চুপ করে থাকে।

—আরও বলতে পারেন, এতো রাত্তিরে আমার সংগে বাড়িতে ফিরতে দেখলে পাড়ার লোকে কী ভাবে নেবে ব্যাপারটাকে? মাসিমা-ই বা কী ভাববেন?

চন্দ্রশেখর ওর দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাকালো। ঠিক এই কথাটিই ভাবছিলো চন্দ্রশেখর—আর কাউকে কিছু ভয় করে না তার, ভাবনাটা বুলু কী

ভাববে। ছোটো বোন সে তার কাছে, কিন্তু বুদ্ধি তো ছোটো বোন-বড়ো বোন ভেবে আসে না।

মানসী চন্দ্রশেখরকে আড়চোখে দেখে নিলো।

—কিংবা এ-ও বলতে পারেন, আজকে রাত্তিরে ঠাণ্ডাটা বেজায় কম আছে, লেপটা গায়ের ওপর রাখা যাবে না মনে হচ্ছে। এমনি কতো কথা বলা যায়। কথার কী শেষ আছে ?

তবু নিরুত্তর চন্দ্রশেখর। এই এতো রাত্তিরে যে-মেয়েটিকে সে পছন্দ করতো না তা-কেও ভালো লেগে যাচ্ছে তার। রাত্রির কোন বিশেষ যাদু-জানা শক্তি আছে নিশ্চয়ই। না হলে মানসীকে তার আস্তে আস্তে ভালো লাগছে কেন। না হলে মানসী নামটাই তার অপছন্দ, কেমন গেঁয়ো রসিকতা বলে মনে হয়, একমাত্র রবীন্দ্রনাথের কাব্যের নাম ছাড়া ওটা যে কোন মিষ্টি নাম হতে পারে এটা সে ভাবতেই পারে না। ওর মনে হয়, একটুক্ষণ পরে হয়ত বা মানসীকে ও সমস্ত যৌবন দিয়ে ভরিয়ে দিতে পারে। আড়ষ্টতা দু'হাতে সরিয়ে দিতে ও-ই যেন মানসীর আর একটু গা ঘেষে চলতে যায়। মানসীর শাড়ীতে ওর পা লাগে। রাত্রি যাদু জানে সত্যিই।

মানসী হাসে।

—তবুও কথা বলবেন না ?

—একটি মাত্র কথা বলতে পারি।

আস্তে আস্তে বলে চন্দ্রশেখর। হিসেব করে করে উচ্চারণ করে যেন কথা ক'টি।

—সেইটেই তো শুনতে চাইছি।

উজ্জ্বল হয়ে ওঠে যেন মানসী।

—কথাটা হলো, তোমার বাড়ির দরজায় পৌঁছে গেছি।

মানসী যেন দাঁড়িয়ে পড়লো। চন্দ্রশেখর ভাবলো, মানসী দরজার কড়া নাড়ার জন্যে থেমেছে নিশ্চয়ই। পেছন দিকে না তাকিয়ে এগিয়ে গেলো সে নিজের বাড়ির দিকে।

তারপরে আর যাওয়া হয়নি বেলাদের বাড়িতে। বিয়ের দিনেও না। সেদিন সুদেষ্ণা ওকে ছুটির পরেই পাকড়াও করেছিল। সমস্তটা সন্ধ্যে কাটিয়ে

দিয়েছিল স্থদেষ্ণার সংগে রেস্তোরাঁয় খেয়ে, এখানে সেখানে ঘুরে বেড়িয়ে। হাসিতে কথায় কলোচ্ছল হয়ে উঠেছিল স্থদেষ্ণা। ও-ও যোগ দিয়েছিল, কিন্তু তেমন করে যেন মাতোয়ারা হয়ে উঠতে পারে নি। কোথায় যেন একটা কাঁটা খচখচ করে বিঁধছিল। কিন্তু কোথায় যে বিঁধছিল' কেন-ই-বা তা সে কিছুতেই ঠাওর করতে পারছিল না। একটা অব্যক্ত অসোয়াস্তি। অথচ স্থদেষ্ণার কাছে সে বেমক্কা ধরা পড়তে চায় না। কিন্তু স্থদেষ্ণার চোখ এড়ায় নি।

—অন্যমনস্ক মনে হচ্ছে যেন আপনাকে?

—অন্যমনস্ক? কই না তো!

এ যে সত্যিকারের বিস্ময় নয় তা-ও যেন চন্দ্রশেখরের নিজের কানেই বেজে উঠলো।

—উঁহু, অনেকক্ষণ থেকে দেখছি, একটু কেমন যেন গা-ছাড়া-ছাড়া ভাব। ব্যাপার কি, শরীর-টরীর খারাপ করে নি তো।

বলেই স্থদেষ্ণা খপ করে ওর পাঞ্জাবী সরিয়ে লোমশ বুকের ওপর হাত রেখেছিল গায়ের উত্তাপ নেওয়ার জন্যে। চন্দ্রশেখর বাধা দিতে পারেনি, এমনকি মুখে একটাও কথা বলে নি। শুধু এই স্থযোগ স্থদেষ্ণার হাতের স্পর্শ টুকু অনুভব করেছিল মাত্র।

—কই না, জর-টর তো হয়েছে বলে মনে হয় না। মাথা ধরেছে?

—মাথা? না তো ধরে নি বোধহয়।

চন্দ্রশেখর উত্তর দেয় স্থদেষ্ণার দিকে চেয়ে।

—বোধ হয় আবার কি? ধরেছে কি ধরে নি?

—তা তো বুঝতে পারছিনে।

—বেশ লোক যাহোক! মাথা ধরেছে কি ধরে নি এটা বুঝতে না পারার কী আছে!

—নেই হয়ত।

—তবে এমন উদাস উদাস কেন?

—আপনি কিন্তু উকীলের জেরা স্থরু করে দিলেন দেখছি।

এবারে চন্দ্রশেখর সচকিত হয়ে ওঠে।

তা আপনি তো অনেকগুলো প্রশ্ন করেছেন, এবারে আমি জিগ্যেস করি। আচ্ছা, আপনার চাকরী করতে ভালো লাগে?

প্রশ্ন শুনে সুদেষ্ণা হেসে উঠলো।

চন্দ্রশেখর বুঝতে না পেরে হাঁ করে তাকিয়ে রইলো।

—এতোক্ষণ চাকরী করা ভালো লাগে কি লাগে না এই দার্শনিক চিন্তায় মশগুল ছিলেন নাকি?

—তা ঠিক নয়। এমনি জিগ্যেস করলাম। সত্যি, বলুন না, ভালো লাগে?

—চাকরী করতে ভালো লাগে কার?

—সে কথা নয়। বলছি, আমাদের আফিসে চাকরী করতে আপনার ভালো লাগে কি না।

—কঠিন প্রশ্ন বটে। এবং প্রশ্ন তো একটা নয়। আমাদের আফিসে ভালো লাগে না অন্য আফিসে ভালো লাগে? আর দ্বিতীয় হচ্ছে, আমার চাকরী করতে আদৌ ভালো লাগে কিনা? এই তো?

—আমি কিন্তু সিরিয়াস্‌লি প্রশ্ন করেছিলাম।

চন্দ্রশেখর একটু নড়ে চড়ে বসে।

—ওঃ। আচ্ছা। তবে বলি, আমার বেশ ভালো লাগে। কেন?

—না, তাই জানতে চাইছি।

—হঠাৎ?

—আমার আগে ভালো লাগতো, এখন কেমন যেন কষ্ট হয়।

—কেন?

সুদেষ্ণার গলায় কেমন একটা সহানুভূতির ছোঁয়া থেকে যায়। চন্দ্রশেখর ওর চোখে চোখে রেখে বলে।

—কিছু করতে চাই, কিন্তু কিছু করার উপায় নেই বলে।

আর কোন কথা বলতে পারে নি সে। এবং খানিক পরেই সুদেষ্ণার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এসেছে মাতালের মতো টলতে টলতে। এমন সুন্দর সন্ধ্যেটা সে মাটি করেছে। এতো উজ্জ্বল সে দেখে নি কোনওদিন সুদেষ্ণাকে। তাছাড়া বেলার কথাটা ঠিক যে অমন একটা ভিন্ন পথ ধরে বেরিয়ে আসবে সেও ভাবে নি। কিছু করতে পারছে না বলে যে যন্ত্রণা তার, যা পাওয়া যেতো চাইলেই সেইটেই হঠাৎ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ভাবনায়ও ঠিক তার সেই যন্ত্রণা।

অথচ কোনও দিনই সে ভাবেনি বেলা সম্বন্ধে। অথচ আজই বেলা যখন হয়ত বিয়ের পিঁড়িতে বসেছে তখন তার নিজের অধিকার বোধের চেতনা এলো। এবং যখন আর তার ফিরে পাওয়ার কোন সুযোগই রইল না।

অনেকক্ষণ পরে ব্যাপারটা অনুধাবন করতে পেরে চন্দ্রশেখর স্বস্তি পেলো। কেন যে সারা সন্ধ্যে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা পীড়া দিচ্ছিল সেটা সে বুঝতে পারলো। এবং তক্ষুনি মনে হলো, বেলার বিয়ে হওয়াটা দরকার, বা বরং বলা চলে, বিয়ে তার হবেই, বেলা কারও না কারোর বউ হবেই। নিঃশেষে নিঃসংকোচে যে দিতে পারে তার-ই তো বউ হওয়া সাজে! চন্দ্রশেখরকে সে অনেক দিয়েছে, নীরবে নিঃশব্দে। কিন্তু কেন যে বেলার দেহটা তার চোখের সামনে এখন স্পষ্ট হয়ে উঠছে না এটা সে ভেবে পায় না। মুখটাই তার মনে পড়ে কেবল, হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যাওয়া প্রবল প্রাণশক্তির সংহত মূর্তিই কেবল চোখে পড়ে অনেকদিন পরে বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে তার। একটা অব্যক্ত অসাড়তা পাক খেয়ে ওঠে মেরুদণ্ড বেয়ে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে আফিসে যাওয়ার পথে চন্দ্রশেখরের মাথার মধ্যে এতো সব কথা ভিড় করে আসে। এমন কি যখন পর পর গোটা কতক বাস ট্রাম ছেড়ে দিয়ে ড্যালহৌসি পৌঁছালো সে তখনও তার মাথার মধ্যে ঘুরছে সব। কাল সন্ধ্যের স্মৃতির কথা থেকেই শুরু, আর আজ সকালের হরিদা'র আকস্মিক আগমন ও নিষ্ক্রমণের ফলে সেই চিন্তাগুলো আর জট পাকিয়ে জটিল হয়ে গেছে। ভেবেছিল, হরিদা'র বাড়ি হয়ে আসবে আফিসে আসার পথে। কিন্তু পরক্ষণেই ভেবেছিল, কী হবে গিয়ে। শৈলেন তার বন্ধু হতে পারে, এক আফিসের সহকর্মী হতে পারে, কিন্তু তাই বলে হরিদা'র হয়ে তাকে কোন কথা বলা চন্দ্রশেখরের সাজে না। পারুলকে বিয়ে করবে কথা দিয়েছে, এবং শৈলেন যদি এই যুক্তির সেতুর ওপর দিয়ে এসে হরিদা'র বাড়িতে মাঝে মধ্যে হাজিরা দিয়ে থাকে এবং এখন যদি পারুলকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে তাহলেও শৈলেনকে দোষারোপ করা যায় না। বিয়ের আগে দেহ দিয়েছে যে মেয়ে আর যাইহোক তাকে বিয়ে করে বৌ হিসাবে ঘরে আনবে না শৈলেন। সব ছেলেরই তেমন মেয়ে সম্বন্ধে কিন্তু কিন্তু থাকে। সুতরাং হরিদা' আপশোষ করলে কী হবে, চন্দ্রশেখরের বাড়ি যাতায়াত করলে চন্দ্রশেখরই বা কী করতে পারে। তবু শৈলেনকে একবার

বলে দেখবে বলে একটা দৃঢ় পণ করে বসলো চন্দ্রশেখর ড্যালহৌসিতে নেমেই। এমন একটা অনর্থ ঘটানো শৈলেনের উচিত হয় নি। পারুলের দোষ থাকতে পারে তাই বলে সমস্ত পরিবারের সংগে এই ধরণের খেলাটা বিপজ্জনক বটে, পরিবারের পক্ষে কলঙ্করও বটে। পারুলের সংগে যা খুসি করো, কিন্তু তার বাবা-মাকে মিথ্যে আশায় ভুলিয়ে এমনভাবে হতাশ করা কেন। এ কাজের কোন সমর্থন নেই।

ড্যালহৌসিতে নেমে ওর হঠাৎ মনে হলো, গাড়িটা বড়ো ফাঁকা ছিল, সমস্ত ড্যালহৌসিটা যেন কেমন ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে। গাড়ি-ঘোড়া যানবাহন যেন অনেক কম। জি পি ও-র ঘড়িটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখলো। সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। কী হবে তবে আর আফিসে গিয়ে, আজ নিয়ে চার দিন লেট হয়ে গেলো, ছুটি তো একটা দিন কাটা যাবেই এমনিতে, তার চেয়ে বরং ক্যাজুয়াল লীভটাই যাক।

আর একবার একটু ইতস্তত করলো চন্দ্রশেখর। এতোদূর এসে ফিরে যেতে ওর ভালো লাগে না। যদি বাড়ি থেকে না বেরুতো তাহলে এক রকম ছিল। আরও খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে ধীরে সুস্থে খেয়ে-টেয়ে আফিসে চাকরী না করা বন্ধুর বাসায় দ্বিপ্রাহরিক আড্ডায় জমা যেতো। কিংবা দুপুরে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে বই-টই পড়া যেতো। তারপরে বিকেল নাগাদ বেরিয়ে ইউনিয়নের মিটিংটায় উপস্থিত থাকতে খুব খারাপ লাগতো না, বেড়ানোও হতো, কাজগুলোও সারা হতো। কিন্তু এখন যায় কোথায়। রুটিনে বাঁধা জীবনে বেহিসেবী হওয়ার সুযোগ এলেও হওয়ার উপায় নেই। তালকানা হয়ে যেতে হয়।

তবু একটা ফিরতি ট্রামে উঠে পড়লো। বরং কখন যে সে ঠিক স্মৃতির বাড়ির দরজায় এসে লোহার কড়া দুটোয় হাত রেখেছে তা সে নিজেই জানে না—যন্ত্রচালিতের মতো এসে হাজির হয়েছে সে। এবং নিজের মনের গভীর তল পর্যন্ত দেখতে পায় বলেই চন্দ্রশেখর নিজের কাছে নিজেই হাস্যাস্পদ হয়ে উঠলো। স্মৃতি যে আফিসে যাবে না, এমন ধারণা তার কেমন করে জন্মাতে পারলো তা সে কোনক্রমেই বুঝতে পারলো না। তারও চেয়ে বড়ো কথা, স্মৃতি এমন অসময়ে তাকে আসতে দেখলে কী ভাববে এটা তার খেয়াল হলো যখন তখন সে দরজার কড়াটাকে ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়েছে। সেই শব্দের তরঙ্গ গৃহস্বামিনীর কানে পৌছানোর আগেই যেন সে লজ্জায় লাল হয়ে পড়লো। এখনও যদি সে ফিরে যায় তবে নিতান্তই বোকামি হবে। অথচ

স্মৃতি ভাববে, কাল সন্ধ্যের অন্ধকারে হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছি তাতেই আজ আফিস কামাই করে ছুটে এসেছে।

যা ভাবে ভাবুক স্মৃতি। না হয় ভাববে হ্যাংলামি, আদেখলেপনা চন্দ্রশেখরের, তবু দরজায় কড়া নেড়ে ফিরে যাওয়াটা কাজের কথা নয়।

আরও একবার জোরে কড়া নাড়লো সে।

ঝি দরজাটা খুলে একমুখ হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা করলো চন্দ্রশেখরকে। চন্দ্রশেখর মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করলো,

—দিদিমণি কী করছেন ?

ওর নিশ্চিত ধারণা হলো স্মৃতি আজ আফিসে যায় নি।

—দিদিমণি ত' বাড়িতে নাই।

—আফিসে গেছেন ?

—চন্দ্রশেখরের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, কাটাছঁাটা।

—না অপিসি যায় নাই,—দেখা করতি গেছেন কার সংগে যেন।

—ও, আচ্ছা। কখন ফিরবেন জানো ?

—না।

—ঠিক আছে। তুমি বসবার ঘর খুলে দাও, আমি তোমার দিদিমণির জন্যে অপেক্ষা করবো খানিকক্ষণ।

ঝি ওকে নিয়ে গেলো বসার ঘরে। এখানে দুতিনখানা ঘর নিয়ে স্মৃতি থাকে। ছিম্‌ছাম গোছ-গাছ করা ঘর। স্মৃতির মতোই স্মৃতির ঘর। আগে কখনও মালিকের অবর্তমানে এমন করে দেখার সুযোগ পায়নি চন্দ্রশেখর। টেবিলের ওপর থেকে খবরের কাগজখানা তুলে নিয়ে বসলো।

—দাদাবাবু, চা খাবেন !

—চা ? আচ্ছা, দিতে পারো।

চন্দ্রশেখর চা খেলো, সিগারেট ধরিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবরের কাগজখানা পড়তে লাগলো, দু' একখানা সিনেমার কাগজেরও ওপর চোখ বোলালো। কিন্তু সময় আর কাটতে চায় না। উঠে পড়ার ইচ্ছে অনেকবারই হলো, কিন্তু সে ইচ্ছে তার ফলবতী হতে পারলো না।

খবরের কাগজ পড়তে পড়তে তার মনটা আপ্লুত হয়ে যায় নানা চিন্তায়। কেন সে এই দুপুরের নির্জনতায় এসেছে স্মৃতি বাড়িতে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখার একটা সুযোগ পায় এতোক্ষণ পরে, তা-ও স্মৃতি বাড়িতে না থাকার জন্যে।

কাল সন্ধ্যেয় যার হাত সরিয়ে দিয়ে চলে গেছে সে আজ আবার তার কাছে দুপুরে একা দেখা করতে আসার মধ্যে একটা মাত্র দুর্বলতা প্রকাশ পায়। সত্যিই কি সে কেবল স্মৃতির সান্নিধ্য চায়। স্মৃতির সিঁথিতে এখনও এয়োতি-চিহ্ন রয়েছে, সবটুকু না জানলেও ইতিহাসের অনেকখানিই সে জানে। স্বামী সম্বন্ধে স্মৃতির যে বিন্দুমাত্র আর দুর্বলতা নেই, এটা সে পাকে-প্রকারে অনেকবারই বুঝিয়ে দিয়েছে চন্দ্রশেখরকে। চন্দ্রশেখর ওর সিঁথির দিকে তাকিয়েছিল যেখানে অতি সংগোপনে এক বিন্দু সিঁদুর তখনও লুকিয়ে থেকে স্মৃতির জীবনের একটা অধ্যায়কে লোকলোচনে অনাবৃত করে রেখেছে। স্মৃতি চন্দ্রশেখরের দৃষ্টি অনুসরণ করে বুঝতে পেয়েছিল চন্দ্রশেখরের অকথিত অঘোষিত প্রশ্ন।

—ওটুকু? ওটুকু সংস্কারের চিহ্ন, অতীতের সাক্ষী, ভবিষ্যতে জের টানবার যোগসূত্র নয়। ভয় নেই।

ভয়? কিসের আর কেন-ই-বা। চন্দ্রশেখর ঐ দুটো কথায় স্মৃতির মনের যেন হদিশ পেয়ে গিয়েছিল। কথা দুটো ওকেই আশ্বস্ত করার জন্যে, এ-প্রশ্নও তার মনে এসেছিল। অবিশ্যি চন্দ্রশেখরের অমন কোন সংস্কারই নেই। কিন্তু কেন সে এসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। সুদেষ্ণার কথাটাও কোন সময়ে তার মনে এসে যায়। এ তো সে বুঝতেই পারে সুদেষ্ণার সংগে স্মৃতির কোথায় একটা প্রভেদ আছে। সুদেষ্ণা ঝাঁপ দিতে চায়, অবশ্য একটু হিসেব করে যাতে একেবারে অতলে তলিয়ে না যায়; আর স্মৃতি নির্ভরতা চায় লতিয়ে বেড়ে উঠবার। সুদেষ্ণা কী চায় এখনও সে বুঝতে পারে নি, কিন্তু স্মৃতির মনটাকে সে অনায়াসেই বিশ্লেষণ করতে পারে, কী যে চায় সে তা বুঝতে যেন বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয় না চন্দ্রশেখরের।

ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে কাগজ পড়তে পড়তে ক্লান্তিতে বিচিন্তায় কখন যে চন্দ্রশেখরের চোখের পাতা দুটো ভারি হয়ে এসেছিল তন্দ্রায় তা সে নিজেই টের পায় নি। তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত সে স্মৃতি আর সুদেষ্ণার কথা ভেবেছিল।

কতোক্ষণ পরে ওর ঘুম ভাঙলো, স্মৃতির ঝি টেবিলে চায়ের পেয়ালা রাখলো একটু শব্দ করে।

—দিদিমণি এসেছেন?

—না, দাদাবাবু, এখনও আসে নাই।

হাত-ঘড়িটা দেখে নিলো, পাঁচটা প্রায় বাজে।

চা খেয়ে তাড়াতাড়ি সে বেরিয়ে পড়লো। বেরুবার আগে ঝি-টা-কে ডেকে বললো,—দিদিমণি এলে আমি এসেছিলাম এটা বলে দিও। একটু দরকার ছিল আমার।

ঝি-টা কোনো কথা না বলে দাঁড়িয়ে রইল। সেই মুহূর্তে ওর কেমন করে কেমন আশ্চর্য অস্বাভাবিক ভাবেই মনে হলো, বেলা ঠিক অমন করে দাঁড়িয়ে থাকতো। প্রিয়জন নিকট থেকে দূরে চলে যাওয়ার সময় বোধ হয় সব বাঙ্গালীর মেয়ে অমন করে চেয়ে থাকে।

বেলার সংগে স্মৃতির ঝি-র সাদৃশ্য কল্পনা করে চন্দ্রশেখর লজ্জা পেলো। যা-তা আজে-বাজে চিন্তায় মাথাটা তার খারাপ হয়ে গেছে নিশ্চয়ই, না হলে বেলার মতো একটা মেয়ের কথা তার এই মাঝবয়েসী ঝিটাকে দেখে মনে হবে কেন?

ড্যালহৌসি যাবে সে। য়ুনিয়নের মিটিংয়ে উপস্থিত থাকবে। আল্‌সেমি তাকে ঘিরে ধরেছে, সব কাজেই ফাঁকি পড়েছে নিয়মিত। একটু দ্রুত পায়ে বেরিয়ে পড়ল চন্দ্রশেখর। বিশ্বনাথের ওপর ছাঁটাইয়ের নোটিশ পড়েছে, তার চরম প্রতিবাদ করবে সে। সমস্তটা য়ুনিয়নকে আফিসকে সচকিত করে দেবে সে। ক্ষুরধার জিহ্বার শাণিত বক্তৃতায় সে চমকিত করে দেবে কর্তাদের। বুঝিয়ে দেবে, ক্ষুধা আর ক্রোধের মধ্যে ব্যবধান খুব কম। মানবতার নামে আবেদন করবে না সে, অধিকার প্রতিষ্ঠার আওয়াজ তুলবে। ইস্‌, কদ্দিন ধরে সে নির্জীব হয়ে গিয়েছে।

ট্রাম থেকে নামলো সে ড্যালহৌসিতে, যখন প্রায় সাড়ে পাঁচটা বাজে। শীতের সন্ধ্যেয় ঘরমুখো মানুসের ভিড় সবে কমতে আরম্ভ করেছে। এদিক-সেদিক তাকিয়ে দেখলো, কোনো চেনা-পরিচিত মুখ দেখা যায় কি-না। সবাই যখন বাড়ি ফিরছে, ও তখন আফিসে ঢুকলো। অবিশ্রাম কৌতূহলী প্রশ্নের বাণ এড়িয়ে এড়িয়ে সে যখন য়ুনিয়ন-রুমে ঢুকলো তখন মিটিং আরম্ভ হয়ে গেছে।

সমস্বর সম্বর্ধনায় স্নাত চন্দ্রশেখর একটিমাত্র কথা বলতে পেরেছিল,

—বাড়িতে একটা কাজে আটকে পড়েছিলাম। ছুটতে ছুটতে তাই আসছি।

মদন ছেলেটির বয়স কম, কিন্তু বড়োদের সংগে ফষ্টিনষ্টিতে ওস্তাদ। ও হেঁকে বললো,

—ছুটতে ছুটতে তো আসছেন চন্দর-দা', ওদিকে আপনার জন্যে কেউ কেউ ছুটোছুটি করছে।

সকলে একটু হাসলো।

সপ্রশ্ন চোখে তাকিয়ে রইলো চন্দ্রশেখর। কে তার খোঁজ করেছে জানবার আগ্রহ হলো। কিন্তু কিছু না বলে চুপ করে রইলো কে হতে পারে সত্যি।

—জানতে চাইছেন না তো কে ছুটোছুটি করছে?

আবার বললো মদন। কিন্তু শচীন ধমক দেয়,

—চন্দ্রশেখর জানে কে হতে পারে। তোমাকে অতো মাথা ঘামাতে হবে না। এখন কাজে মন দাও।

মিটিং-এর কাজ মিটতে মিটতে অনেকটা রাত হলো। মিটিং-এর শেষে চন্দ্রশেখর জানতে পারলো সুদেষ্ণা কয়েকবার ওর খোঁজ করেছে।

এতোক্ষণ পর্যন্ত, সেই স্মৃতির বাড়ি থেকে বেরুনো পর্যন্ত চন্দ্রশেখর ঠিকই করে ফেলেছিল যখনই স্মৃতির সংগে ওর দেখা হবে তখনই স্পষ্টাস্পষ্টি বলে ফেলবে. এই ছলনার শেষ হোক, হেস্ত-নেস্ত একটা হয়ে যাক। সন্ধ্যের আলো-নিবুনো অন্ধকারে চন্দ্রশেখরের হাত নিয়ে খেলা করা নয়, হৃদয় নিয়ে খেলা করাটাই বন্ধ হোক। ভালোলাগা-মন্দ-লাগার ব্যাপার নয়, স্মৃতির যদি তাকে প্রয়োজন হয় তবে তারও প্রয়োজন স্মৃতিকে। উন্মুখর যৌবন তার দেহের সীমায় আছড়ে পড়ুক। স্মৃতি যদি বলে,

—লোকে কী বলবে তা ভেবে দেখেছ?

তাহলে ও বলবে,

—সে ভাবনা লোকের. আমার তোমার নয়।

আর যদি বলে,

—তোমার বাড়ির লোকে কি কোনো মেয়ের দ্বিতীয় পক্ষে রাজি হবেন? আর এই আমার মতো আফিসে চাকরী-করা মেয়েকে ঘরে তুলতে রাজি হবেন তোমার বাবা-মা-ভাই-বোন?

ও তখন বলবে,

—সে ভাবনা আমার। ভার যদি বহন করতে পারি, ভরসা করবো কেন অপরের সম্মতি-অসম্মতির। তা ছাড়া, আমার বাবা-মা আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে

যাবেন না বলেই মনে হয়। নিজের জীবনে সংস্কারের খুঁটিতে জড়িয়ে থাকবো, আর বাইরে বিপ্লব করবো, এটা হয় না। সে বিপ্লব ধোপে টেঁকে না।

এই রকমই ভেঁজে রেখেছিল চন্দ্রশেখর। এবং তাতেই তার উন্মাদনা খানিকটা স্তিমিত হয়ে এসেছিল। বেলা যদি মুখ ফুটে বলতো তাহলে হয়ত ভালো লাগতো না, বেলার সম্পর্কে অন্তঃশীলা শ্রদ্ধার উৎসটা তার কাছে শুকিয়ে যেতো। কিন্তু স্মৃতির পক্ষে বেলার ব্যবহার বেমানান। আর তাইতেই তো স্মৃতিকে যে তার প্রয়োজন এটা মনে হতে বেশিক্ষণ সময় লাগে নি। বেলার ব্যাপারে যে ডিসিসান্-এ আসতে তার নিরতিশয় দেরি হয়ে গিয়েছিল, এবং যার জন্যে এখনও বুকের মধ্যে একটা বেদনা খচখচ করে বেঁধে, সেই ডিসিসানে আসতে তার খুবই কম সময় লাগলো স্মৃতির বেলায়। বলা চলে কয়েকটা ঘণ্টা মাত্র। আর সুদেষ্ণার সংগে দিনের মধ্যে কয়েকটা ঘণ্টা কাটিয়ে দেয় অফিসে এবং আফিসের বাইরে। নানা রোমান্টিক গল্পের খোরাক হয় সে আফিসের লোকের কাছে। অন্য মেয়েরাও তাদের কৌতূহল দমন করে চন্দ্রশেখর সম্বন্ধে। তবু কখনও তার এ কথা মনে হয় নি ঘুণাক্ষরেও সুদেষ্ণাকে সে ভালোবাসে। সুদেষ্ণার টেবিলে গিয়ে বসে, সুদেষ্ণার সংগে রেস্তোরাঁয় গিয়ে খায়, গীতিতীর্থে সুদেষ্ণার গানও শোনে, কিন্তু আরও একটা দিক যেন ইচ্ছে করেই সে ভুলেছিল। কোনওদিন সেদিকে দুর্বল দৃষ্টিও দেয়নি

আজ সুদেষ্ণা তার খোঁজ করেছে কয়েকবারই। আরও অনেকদিন সে অফিসে আসে নি ; পরের দিন দেখা হলে বড়ো জোর জিগ্যেস করেছে,

—আসেন নি কেন ? কী হয়েছিল ?

এবং উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করেনি, প্রসংগান্তরে চলে গিয়েছিল। চন্দ্রশেখরও উত্তর দেওয়ার আগ্রহ দেখায় নি বা অন্য প্রসংগে গিয়ে উত্তর দেওয়ার দায় এড়িয়েছে।

ড্যালহৌসি থেকে এসপ্লানেডে এলো চন্দ্রশেখর।

ঠিক করে ফেল্‌লো, সুদেষ্ণাকে বলে দেবে দু'জনের পথ নয়। বেলার বিয়ের রাতে তাকে না হক্ আটকে রেখে চিরজীবনের মতো একজনের কাছে তাকে ছোটো করে দিলো সুদেষ্ণা। বেলার বিয়ের দিনে না যাওয়াটা অকৃতজ্ঞতাও বটে, ওর দুর্বলতাও তাতে প্রকাশ পায়ও বটে।

◦ কিন্তু সুদেষ্ণা তাকে খোঁজে কেন। শুধু ওর সংগে শীতের সন্ধ্যে কাটানোর জন্যে?

বাড়ির ট্রামে না উঠে, গীতি-তীর্থে যাওয়ার পথ ধরে সে।

ট্রামে উঠেই এক ঝলকে মনে হলো, সুদেষ্ণা খুব ভালো রবীন্দ্রসংগীত গায় না, তবে গীতিতীর্থে যায় কেন। শিখবে বলে? না শেখাবে বলে? তবে যে সেদিন বল্‌লো, চাকরী করতে ওর বেশ ভালো লাগে, সেটা কি সত্যি কথা নয়? ও-ত নিশ্চয়ই কিছু একটা করতে চায় চন্দ্রশেখরের মতো।

নাঃ, মানুষ দুটো ফ্রণ্টে একসংগে লড়াই চালিয়ে যেতে পারে না, দু'দিকে অনিশ্চয়তা অস্থিরতা। স্মৃতির কাছে চন্দ্রশেখর যে-কোন একটা মানুষ মাত্র, তাই নয় কি? আর সুদেষ্ণার কাছে?

গীতিতীর্থের কাছে এসে ট্রাম থেকে নামে সে।

আর একটু পরেই যা ছিল না-বলা বাণীর ঘন যামিনীর মাঝে রহস্যাবৃত তা হয়ে যাবে স্বচ্ছ দিনের আলোর মতো। ভারটা কেটে গেলো মনের। যুদ্ধে বিক্ষত সৈনিক নয়, শ্রান্ত-ক্লান্ত বিপর্যস্ত নয়, এখন বিনা যুদ্ধে জয়লাভের কৃতিত্বের অবসাদ। চন্দ্রশেখর অনেকদিন পরে সহজ হতে পারলো। চারদিকের দোকান-পাট, লোকজন দু চোখ ভরে দেখতে দেখতে গীতিতীর্থে পৌঁছালো।

গীতিতীর্থে আসেনি সুদেষ্ণা। আসবে কিনা তার ঠিক নেই। যাক্, আরও খানিকক্ষণ এই ভারহীন হয়ে কাটাতে পারবে সে, উপভোগ কর্‌তে পারবে চারিদিকে জীবনের কলরব। বিশ্বনাথের চাকরী যাওয়াটা নৃশংসতা, বর্বর বন্যেরাই মানুষের মুখের অন্ন কাড়ে। রক্তপিপাসু তারা। বন্যবরাহ।

উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে চন্দ্রশেখর।

নাঃ, দুটো ফ্রণ্টে মানুষ লড়াই করতে পারে না। চন্দ্রশেখর একটা দিকে নিশ্চিন্ত হবে।

গীতি-তীর্থ থেকে বেরিয়ে এলো সে। রাত্রি নেমেছে শহরে, গলে গলে পড়ছে যেন রাত্রি শীতের কলকাতার রাস্তায়। ফ্যাকাশে লাগছে রাস্তার শরীর, ট্রামের লাইনগুলোও যেন কেমন বিবর্ণ হয়ে গেছে। মেদুর হয়ে আছে চারদিক।

এখনও ওঠেনি চাঁদ আকাশে। ধূসর মেঘের আড়াল থেকে শুধু তার বিভা দেখা যায়। ঠাস-বুনোন কাপড়ের মতো জমাট শীতের রাত। গ্রীষ্মের রাতের মতো রেশমী কাপড় নয় এ-রাত।

সমস্ত উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে আসে, সমস্ত উন্মাদনা-শিথিল স্নায়ুতে অবসাদ আনে এ-রাত্রি।

জানলার ফাঁক দিয়ে মোমের বাতির আলোয় যে রাত্রি দেখতে অভ্যস্ত চন্দ্রশেখর, এ সে-রাত্রি নয়। এ-রাত্রি জাদু জানে।

এদিকে সেদিকে ইতস্তত পদচারণা করে চন্দ্রশেখর সুদেষ্ণার বাড়ির দিকে চল্‌লো।